

দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলা প্রতিবাদী নাটকের ধারা

‘প্রতিবাদ’ আধুনিক মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘকালীন বঞ্চনা ও পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিবাদ করেই বাঁচতে হয়। লড়াই করে বাঁচা একালের একটি প্রধান স্লোগান। মানুষকে হয়ত বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই করেই বাঁচতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন তার কারো বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না। আধুনিক মানুষেরই কেবল প্রতিবাদ আছে। এই প্রতিবাদ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। মানুষ তার সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিটি স্তরেই বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে। এর দ্বারাই আদিম মানুষ আধুনিক মানব সভ্যতা তৈরি করতে পেরেছে। লড়াই করবার প্রথম পর্যায়ে আছে মানুষের প্রতিবেশ সম্বন্ধে চেতনা। এই চেতনা যেরকমেরই হোক না কেন সমৃদ্ধ না হলে প্রতিবাদ হয় না। যেখানে পরিবেশ পরিস্থিতি তা সে সামাজিক, রাজনৈতিক যাইহোক না কেন মানুষের জীবনের উপর চেপে বসে, তাকে বশ করতে চায়, তার বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিবাদ করতে হয় অথবা অসহায় ভাবে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কিন্তু বেশিদিন আত্মসমর্পণ করে থাকা যায় না। একদিন মানুষকে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হয়। ব্যক্তি মানুষ যখন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়—তখন সে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়। একক ব্যক্তির প্রতিবাদ প্রায়শই ইতিহাস রচনা করতে পারে না। কিন্তু একক ব্যক্তির চেতনা যখন বহু মানুষের চেতনাকে পরিণত ও সমৃদ্ধ করে তখন তা সমষ্টির ধর্মে পরিণত হয়। আর সেই সমষ্টির প্রতিবাদই কোনো পরিস্থিতির বদল ঘটাতে পারে—system কে পরিবর্তন করতে পারে।

প্রাচীন সমাজে ব্যক্তি মানুষই প্রথম পরিবেশ পরিস্থিতির সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং বহু মানুষের মধ্যে তার চেতনাকে প্রচারিত করে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। কখনো সে ‘system’কে বদল করতে পারে কখনো বা পুরো বদল করতে না পারলেও কিছু পরিবর্তন আসে। যাঁরা সমাজ পরিবর্তন নিয়ে চিন্তাচর্চা করেছেন তাঁরা বলেন এই পরিবর্তন নানা রকমের হতে পারে। কখনো তা একটা সমাজের মূল্যচেতনাকে বদল করতে পারে কখনো বা সমগ্র পরিস্থিতির আমূল রূপান্তর সাধন করে। এই অনুসারে এই পরিবর্তনকে কখনো বৈপ্লবিক কখনো বা সংস্কারপন্থী বলে মনে করা হয়। কখনো মানুষের এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সফল হয় কখনো ব্যর্থ হয়। প্রাচীন রোমানদের সমাজে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে শোষিত মানুষের বিদ্রোহ ব্যর্থ

হয়েছিল। আবার যীশুখ্রিস্টকে ত্রুশবিদ্ধ করেও তাঁর প্রচারিত মতাদর্শ এবং সমাজের system -এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকে ব্যর্থ করা যায়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এইরকম ব্যক্তি মানুষের চেতনা সম্পন্ন পরিবর্তন কামনা কখনো সমাজের মূল্যচেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে—পুরোনো ধ্যান ধারণাকে নূতন ধ্যান ধারণার দ্বারা পরিবর্তিত করেছে। ব্যক্তি মানুষই যে কোনো প্রতিবাদের প্রথম উচ্চারক কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিবাদ প্রায়শই অসফল। তাই ব্যক্তিকে সমাজ সংগঠনের আশ্রয় নিতে হয়। বুদ্ধকে সংঘ তৈরি করতে হয়েছিল—সেই সংঘই তার নবজাগ্রত চেতনার ধারক ও বাহক। একালে ব্যক্তি মানুষ সংগঠন তৈরি করে যে আন্দোলন করে—তার মূলে থাকে ব্যক্তিগত প্রতিবাদী ভাবনা। আর এই প্রতিবাদী ভাবনা বহু মানুষের অন্তরাশ্রয়ে যখন বিস্তার পায় তখন আসে সমাজ আন্দোলন। প্রতিবাদ আন্দোলনের বীজসূত্র। আর আন্দোলনের লক্ষ্য পরিবর্তন। সে যে কোনো রকমেরই হোক না কেন।

এই আন্দোলনের শরিক সেই সব মানুষ যারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো ভাবে বঞ্চিত। এই বঞ্চিত মানুষ তাদের প্রতিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে এই শোষণ বঞ্চনার প্রতিকার চায়—তারা ক্ষমতা অর্জন করতে চায় “Movements are conscious efforts on the part of men to mitigate their deprivation and secure justice”^{১১}

প্রতিবাদের মূলে থাকে একটা মতাদর্শ, একে নির্ভর করেই সে সামাজিক, রাজনৈতিক অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। এই প্রতিবাদের জন্য বহুব্যক্তির সংগঠনই মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। একক ব্যক্তির প্রতিবাদ প্রায়ই অসফল হতে বাধ্য। বহুর প্রতিবাদের জন্য চাই তাদের চেতনার জাগরণ, সংঘর্ষে লিপ্ত হবার বাধ্যবাধকতা। মানুষকে সংগঠিত করা। The efforts needed to arouse their consciousness, the inevitability of conflict in the process of mobilization. জনগণকে প্রতিবাদের অভিমুখী করবার জন্য চাই রাজনৈতিক চেতনা এবং আদর্শগত ধারণার সম্প্রচার Political Orientation and Ideological Commitments.^{১২} এই কাজে প্রচারাভিযান, বক্তৃতা সভা ইত্যাদির সঙ্গে সাহিত্যেরও একটি বড় ভূমিকা থাকে। জনগণের মনে আদর্শগত ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠার কাজে সাহিত্য অন্যতম বাহন হয়ে উঠতে পারে। সাহিত্য মানুষের মনে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে। তাকে নূতন মূল্য চেতনায় দীক্ষা দেয়। ‘Literary Protest... upholds certain values in a specific environment.’^{১৩} শুধু নূতন মূল্যচেতনাকেই সাহিত্যিক প্রতিবাদ মানুষের মনে সুনিবিষ্ট করে না—সাহিত্যকে অবলম্বন করে বহু মানুষের চেতনার ঐক্য সাধন ঘটতে পারে। মানুষের শিক্ষা, রুচির সংগঠন, মূল্যবোধের নবায়ন, সাহিত্যবোধের প্রতিষ্ঠা, ভাষাবোধ শিল্পচেতনা চেতনার পরিমার্জন

সাহিত্যের মাধ্যমেই ঘটে। সাহিত্য রাজনৈতিক সামাজিক উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদের মতো করে বলে না। তার বলার মধ্যে শ্লোগানধর্মিতা নেই, রাজনৈতিক আক্রোশ আক্রমণ নেই। সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষকে যেমন সচেতন করা যায়, যেমন অচল মতাদর্শের জায়গায় নূতন বাস্তব সম্মত ধ্যানধারণা আনা যায় তেমনি তার মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কাছে সৎ-অসতের ভালো-মন্দে ধারণা ফুটিয়ে তোলা যায়। রাজনৈতিক বা দলীয় সংগঠনের প্রতিবাদের ঝাঁঝালো আক্রমণ সাহিত্যে নেই। তা অনেক মৃদু মার্জিত কিন্তু দূরবিসর্পী বহু মানুষের চেতনার অন্তরালে তার সংগোপন সঞ্চরণ। সাহিত্য প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলন করে না কিন্তু যত রাজনৈতিক বা আদর্শগত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে—তার প্রেরণা এসেছে সাহিত্য থেকে। সোভিয়েত রাশিয়ায় যে সমাজ পরিবর্তন ঘটে এক শক্তিশালী সাহিত্য ছিল তার বাহন। চীনে মাওসেতুং নিজে এই আন্দোলনের অভিপ্রায় কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। রামমোহন বিদ্যাসাগরের সমাজ বদলের বাহিকা শক্তি ছিল তাঁদের রচনাবলী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা এসেছে তার সাহিত্য থেকে। আফ্রিকায় আধুনিক সাহিত্য কালো মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ‘আঙ্কল টমস কেবিন’ আর ‘নীলদর্পণ’ দুইই সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বই। তারাশঙ্করের ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ ‘আঙ্কল টমস কেবিন’ আর আনন্দমঠের শিক্ষায় দীক্ষিত।...

সাহিত্যের শাখাগুলি নিজের পরিসরের মধ্যে থেকে এই নবীন মূল্যচেতনার জাগরণে সামাজিক সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানিক অচলায়তনের কার্য প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কবিতা প্রতিবাদকে মানুষের অনুভূতিতে গেঁথে দেয়—তার আবেগের শক্তিকে জাগায়, প্রবন্ধ মানুষের চিন্তার প্রসার ঘটায়, তার মস্তিষ্কের শক্তিকে সংগঠিত করে। কোন অচল প্রতিষ্ঠা চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে মানুষের জাগ্রত হওয়া দরকার, কোন ধ্যানধারণা মানুষের পক্ষে শুভ, কোন অনুভূতি বা বোধে মানুষের ভাবজগতের সংগঠন হওয়া বাঞ্ছনীয় সাহিত্য তারই অগ্রপথিক। সাহিত্যের যেকোন শাখাই প্রতিবাদের বড় হাতিয়ার। শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ বা ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্প দুটি সমাজ বিষয়ে মানুষের মনকে যতটা জাগ্রত করতে পেরেছে, রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ যত মানুষকে পণপ্রথার সম্বন্ধে সচেতন করেছে তার তুলনা বিরল। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’, রবীন্দ্রনাথের ‘ভারততীর্থ’, ইকবালের ‘সারে জাহাসে আচ্ছা’ মানুষকে জাতীয়বোধে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে এই ধরণের সাহিত্য মানবচেতনার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে নাটকের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ নাটক দৃশ্যকাব্য অন্যগুলি শ্রব্য কিংবা পাঠ্য। এই দৃশ্যময়তা নাটক এবং তার আধুনিক উপশাখা সিনেমার সবচেয়ে বড় জোর। নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রী যে রকম জীবন্তভাবে মানুষের মনের

উপর दाग केटे याय ता अन्य शिल्प माध्यम ततोटा पारे ना । द्वितीयत नाटकेर समसामयिकता तार आर एकटि जेोर । सबरकम मानुषई कवितार आग्रही पाठक, प्रबन्ध साहित्येर पाठक सब युगेई मुष्टिमेय; नाटक दर्शकेर काछे यतटा आग्रहेर ता अन्य कोनो शिल्प माध्यम नय । नाटक—यात्रा—सिनेमा—लोकनाट्य सबकेई एई नाटकेर शाखार अस्तुर्भुक्त करते हवे । यात्रा-नाटक-सिनेमा प्रत्यक्षभावे मानुषेर मनके छुँये येते पारे । आर तार विषय कोनो अतीत नय उँकल्लना नय—एकान्त वास्तव एकेवारेई सामयिक—मानुषेर परिपार्श्व—परिवेश राजनीति समाज अर्थनीति तार विषय । ये कथा से भावे ये विषये तार आग्रह, यार सम्बन्धे तार प्रतिवाद अथच ये कथा से नाना वास्तव कारणे स्पर्धेर कारणे वा संघातेर चिन्ताय बलते पारे ना ये कथा से निजे उँच्चारण करते पारे ना—अथवा ये कथार उँदोधन तार मने हयनि—अथच हओया सम्भव; नाटक अत्यन्त सुस्पष्ट सूचितित वास्तव सम्मत पद्धतिते एकान्तभावे तारई बोधगम्य भाषाय ताके जानाय । कवितार मते दुर्बोध्य हओया तार चरित्रे नेई, प्रबन्धेर मते चिन्ताशीलताओ तार चरित्र नय किन्तु कविता ये आबेगेर भूमिते ताके नये याय प्रबन्धेर विषयनिष्ठ चिन्ता चेतना ताके ये माटिते प्रतिष्ठा दिते याय—नाटक तई करे—तई बलते चाय । एजन्य साहित्येर सबगुलि शाखार मध्ये नाटक सबचेये जनप्रिय एवं सेई कारणे जनसंयोगेर भूमिकाय खद्द । सेई कारणे नाटक जनसंयोगेर सबचेये शक्तिशाली माध्यम । आमरा आगेई बलेछि mobilization वा जनसंयोग प्रतिवादेर जन्य अत्यन्त प्रयोजनीय एकटि उपाय । साहित्य से काज करे किन्तु नाटक सबचेये बेशि करे से काज करते पारे ।

आगेई बलेछि समसामयिक समस्यार उपस्थापना नाटकेर काज । आर प्रतिवाद तो समकालीन परिस्थितिर विरुद्धे मानुषेर अधिकार प्रतिष्ठार लक्ष्येई करा हये थाके । समकालीन ये सब ध्यानधारणा ये सामाजिक संगठन किंवा ये मूल्यबोध समाजके नियन्त्रण करे थाके साहित्ये तार समालोचना करा हय—तार परिवर्तन साधनेर जन्य सेई समालोचनाई तार प्रतिवाद । एकजन समाजविज्ञानी लिखेछेन समाजेर इतिहासेर गतिप्रकृति तार संगठनेर मध्येई से अवस्थाेर परिवर्तनेर सूत्र निहित थाके । नाटक विशेष भावे एई समाज इतिहासेर गतिप्रकृतिर धाराटिर सचेतन पर्यवेक्षक एवं सुनिपुण रूपकार । नाटके एई समाजेर वास्तव जीवनेर गतिप्रकृतिके येमन भावे पर्यवेक्षण एवं रूपायण करा हय ताते दर्शक साधारणेर जीवनचेतनारई रूपायण हय । दर्शक एवं नाट्यकार अभिनेता एकई समाज अभिज्ञतार धारक एवं बाहक । ताछाड़ा नाटकेर एई अभिज्ञता रूपायणेर नाना प्रयोग पद्धति थाके । कখনो से सचेतन पर्यवेक्षक—केवल वास्तव सम्मतभावे समाजेर रूपकार; कখনो से तार व्यञ्ज विद्रूप हसि कौतुकेर माध्यमे तार

সুকঠোর সমালোচক—কখনো আবার সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পীড়নের পাদপীঠে যে জীবন বলিদান নিষ্পন্ন হয়ে চলেছে তার সক্রিয় ভাষ্যকার। এই কারণে নাটকের মধ্যেই সমসাময়িক জীবন যাপনের ছবি যতো সুনিশ্চিত ভাবে প্রকাশ পায় এমনটা অন্যত্র হয় না। T. K. Oommen লিখেছেন—‘সামাজিক আন্দোলনের অধ্যয়নের জন্য সমাজের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও হতে হয় the future vision of the society’^৪ সম্পর্কেও জানা থাকা দরকার। নাটকের লেখক কেবল যে সমাজের রূপকেই ফুটিয়ে তুলবেন তা নয় তিনি সমাজ সম্বন্ধে একজন আশাবাদী মানুষ। তাঁর আছে একটা মতাদর্শ বা Ideology, তাঁর আছে ইতিহাসের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা এবং মানুষের জীবন ও মানুষের সমাজ সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যতের রূপরেখা। তিনি নাটকের মধ্যে ব্যক্ত করবেন সেই দর্শন বা বোধ—যা তাঁর দর্শকদেরও চিন্তায় সমৃদ্ধ করবে এবং সমাজের ও মানুষের আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ভাবাদর্শে সঞ্জীবিত করে সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে উঠবে।

সাহিত্যের প্রতিবাদ ঠিক সভাসমিতির মিছিল শ্লোগানের প্রতিবাদ নয়। তার কণ্ঠস্বর উচ্চকিত কল্লোলমুখর নয়—বরং অনেকটা নীচুগলায় সাধারণ কণ্ঠস্বরে জীবনের অসঙ্গতির উদ্ঘাটন। এই অসঙ্গতির রূপ তুলে ধরেই তার জীবন সমালোচনা এবং নবমূল্যচেতনার পক্ষে সওয়াল। অবশ্য নাটকের প্রতিবাদ সব সময় যে নীচুগলার কথা হয়ে থেকেছে তা নয়—কখনো কখনো তার বলার মধ্যে চড়া গলার আওয়াজ শোনা যায়নি তা নয়। অনেক সময় বক্তব্যের চাইতে সংলাপের উচ্চাচতায় নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। এই শ্রেণীর প্রতিবাদের ভাষায় সাহিত্যের পরিমার্জিত রূপ ফুটিয়ে তোলার চেয়ে বাইরের মিছিলের কণ্ঠস্বর প্রবলতা পায়। কিন্তু নাটকের প্রতিবাদ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রতিবাদ সাধারণত মার্জিত ভঙ্গীতে বক্তব্যের এবং ভাষার পরিমার্জিত রূপের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। ‘Rising of the Moon’ বলে Lady Gregory যে একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন তার বিষয় আয়ারল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলনের, কিন্তু তাতে একটি সংলাপও উচ্চকণ্ঠে বলা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ বা ‘রক্তকরবী’ নাটকের সংলাপ কিংবা সঙ্গীতে কোথাও উত্তাপ ঘনিয়ে ওঠেনি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে ইবসেন যে ‘ডলস হাউস’ নাটক লিখেছিলেন, সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে যে ‘Enemy of the people’ নাটক লিখেছিলেন তাতে কোথাও উচ্চকণ্ঠ সংলাপ নেই। মনোজ মিত্রের ‘চাকভাঙা মধু’ কিংবা ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ নাটক একালের সমাজ-অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে লেখা। তার মধ্যে আছে পরিহাস বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ, কখনো বা নিরুদ্ধ ক্রোধ এবং অসহায় আত্মসমর্পণের কথা কিন্তু বলার ভঙ্গীতে কোথাও সেই উচ্চকণ্ঠের উত্তাপ নেই। আসলে নাটক যাই প্রতিবাদ করুক না কেন সে একটা শিল্পমাধ্যম এবং শিক্ষিত দর্শকেরা মধ্যে উপস্থিত হয়ে সে নাটক আত্মদান করেন। অভিনেতা

কিংবা দর্শকের চরিত্রের মধ্যে কোনো শ্রেণীবৈপরীত্য নেই। কেবল অভিনেতা ও দর্শকের বিভাজনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিনয় মঞ্চ। সাহিত্য কী উপায়ে তার প্রতিবাদী স্বরকে উপস্থাপন করে সে কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্রমোহন লিখেছেন— ‘(Literary Protest) Concened more with the ironics, contradictions and Paradoxes’।^৬ রামনারায়ণ তর্করত্ন যখন ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ লিখতে যান তখন এই বিষম বিবাহ ব্যবস্থা দেখে শেষ কালে হরি ধ্বনি দিয়েছিলেন—

বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল।

বিবাহ নির্বাহ হল হরিহরি বোল।

প্রতিবাদ কেমন হবে তা নির্ভর করে নাটকের বিষয়বস্তু, প্রতিবাদের লক্ষ্য এবং সমাজের পরিস্থিতির উপর। MSA Rao তিনরকম সামাজিক আন্দোলনের কথা বলেছিলেন : সংস্কারমূলক, রূপান্তর মূলক এবং বিপ্লবাত্মক। সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির মধ্যে সংঘাত কম সামঞ্জস্যের ভাব বেশি থাকে অন্যদিকে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে সামঞ্জস্য নেই সংঘাতই একান্ত। নাটকের যে প্রতিবাদের ভাষা রামনারায়ণ ব্যবহার করেছেন বা বাংলা নাটকের প্রথম যুগে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে সংঘাত অপেক্ষা সংস্কারই অধিক। এজন্য শ্লেষ ব্যাজস্তুতি, বিরোধভাস এই নাটকগুলির প্রধান উপাদান। শ্লেষ বিদ্রুপ প্রকাশের একটা বড় উপায়। এই পদ্ধতি প্রায় সব নাট্যকারই ব্যবহার করেন। কথাকে বাঁকিয়ে মোচড় দিয়ে ভুল ভাবে উচ্চারণ করে বা কেবল শব্দ সাদৃশ্যে নুতন শব্দ ব্যবহার করে কৌতুক বিদ্রুপ ও একরকম প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। রামনারায়ণ অশিক্ষিত স্বার্থসিদ্ধি পরায়ণ ঘটকের মুখে যখন শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়ার জন্য বেঙ্গলিক পুরাণের মাংলামি খণ্ডের উল্লেখ করেন তখন এই কৌতুক এবং অশিক্ষিত ঘটকের কাজকর্মের পরোক্ষ সমালোচনাও করা হয়। মধুসূদন নব্যশিক্ষিত কালীবাবু নববাবুর মুখে শ্রীমদভাগবতকে যখন বলান ‘শ্রীমৎ ভগবতীর গীত’ আর গীতগোবিন্দকে বলান ‘বিন্দে দূতীর গীত’ তখন কেবল কৌতুক নয় নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর শূন্যগর্ভতাও তুলে দেখান। ধর্মধ্বজী ভক্তপ্রসাদের মুখে নব্যশিক্ষার নিন্দা করে মুসলমানী ফতিমার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুলতা এই শূন্যগর্ভ নৈতিকতার ছবি ফুটে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অলীকবাবুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—“কালিদাসই তো মুঞ্চবোধে লিখে গেছেন যে বিদ্যাহীনা ন শোভন্তি বৈশাখে নর বাঁদরী।”^৭ তখন এই ভুল reference অর্থহীন শ্লোক অলীকের অলীকতাই শুধু স্পষ্ট করে না, এই শ্রেণীর মানুষের বাবুগিরির মূলেই আঘাত করে। শব্দ বিভ্রম তৈরি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি কৌতুক সৃষ্টির পদ্ধতি। “আমাদের শাস্ত্র অগাধ জগদম্বা বিশেষ”^৮ “অনেক তত্র-বিতত্র হল”, “মুক্ত কণ্টকে স্বীকার করতে হবে”^৯ এই শব্দবিভ্রমের উদাহরণ। শ্লেষ কৌতুক ব্যাজস্তুতি নয় অত্যাচারের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা দর্শকের মনে তীব্র আঘাত দিয়ে একটা প্রতিবাদের সৃষ্টি করে।

ক্ষেত্রমণির উপর রোগ সাহেবের অত্যাচারের দৃশ্য দর্শকের মনে তীব্র বিদ্বেষ এবং প্রতিবাদ তৈরি করত। কথিত আছে বিদ্যাসাগর নাকি তা দেখে চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

স্বাজাত্যবোধ উদ্দীপণের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসকে আশ্রয় করেছিলেন। আরো অনেকেই করেছেন। উপেন্দ্রনাথ ইতিহাসের আড়াল না রেখে সম্পূর্ণ সমকালীন বাস্তবতার আশ্রয়ে নাটক লিখলেন। এই বাস্তব পরিস্থিতিটাকেই অনেকে উপেক্ষা করে গেছেন। উপেন্দ্রনাথ মঞ্চে তাকে স্থান দিলেন। নীলদর্পণে এই বাস্তবকে ধরা হয়েছিল। চাকরদর্পণেও তাই। সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটকে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত দেখিয়ে নাট্যকার তখনকার ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে যেমন আঘাত করেছেন তেমনি নাটককেও দর্শকদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটক সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল “দুইখানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক অদ্যাবধি বাহির হয় নাই।”^৯ পুলিন দাস তাঁর ‘বঙ্গরঙ্গ মঞ্চ ও বাংলা নাটক’ বইতে লিখেছেন—“রূপকের আড়াল ত্যাগ করে ইংরেজ রাজশক্তি ও স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সংঘর্ষকে নাটকের কেন্দ্র গত বিষয় করে, তিনি সম্বাসবাদী রাজনীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।”^{১০} ‘শরৎসরোজিনী’ নাটকে শরৎ চরিত্রের সংলাপে তিনি বলিয়েছেন—“পদে পদে ইংরেজদের বিজাতীয় অহংকার দেখেও কি রক্ত ধমণীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হচ্ছে না?”^{১১}

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নবজাগরণের ভাবধারা এসে বাঙালীর চেতনালোককে আলোকিত করে। কিন্তু সার্বিকভাবে সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সেই নবনব চিন্তার প্রভাব পড়ে নি - সর্বস্তরের মানুষের মন আলোকিত হতে পারেনি। কলকাতার মুস্টিমেয় নব্যশিক্ষিতের মধ্যেই তার প্রভাব পড়েছিল। ফলে গোটা বাংলাদেশ দূরের কথা কোলকাতার সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সেই নূতন জীবনচেতনা দেখা যায় না। কোথাও আবার সেই নবচেতনা কেবল আচারে আচরণে দেখা দিয়েছে কিন্তু ভাবচেতনা তার দ্বারা আদৌ পরিবর্তিত হয়নি। মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা’ বা দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ নাটকে এই শ্রেণীর মানুষের কথা পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের বাংলা নাটকে প্রতিবাদের তিনটি মুখ্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

১. সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

২. অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

৩. রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ এবং বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বলাবাহুল্য পরের দুটিকে সামাজিক সমস্যারই সম্প্রসারিত রূপ বলা যেতে পারে।

সামাজিক সমস্যাগুলিকে আবার নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন—

ক. সামাজিক প্রথা ও সংস্কার-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য-প্রথা,

বহুবিবাহ, পণপ্রথা।

খ. নারীর জীবনকেন্দ্রিক সমস্যা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

গ. ধর্ম ও নৈতিকতার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঘ. বেশ্যানুরক্তি ও মদ্যপান জনিত সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে উনিশ শতকে চেতনার প্রকাশ দেখা গিয়েছে দর্পণ নামের নাটকগুলিতে। যেমন—নীলপর্দা, চাকর দর্পণ জমিদার দর্পণ ইত্যাদি। অর্থনীতি মূল লক্ষ্য হলেও সমাজের অন্যান্য স্তরের কথাও বাদ পড়েনি এই নাটকগুলিতে।

রাজনৈতিক চেতনার উদ্দীপন বাংলা নাটকের প্রথম পর্ব থেকেই অনতিস্ফুটভাবে দেখা গিয়েছে। কতকগুলি নাটকে কেবল চেতনার উদ্দীপণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই পর্বেরই কিছু নাটকে রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষের কথা এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধারণা এসেছে। নাটক হিসেবে এগুলির মূল্য তত নয় কিন্তু এগুলিতেই প্রথম বিরুদ্ধ রাজনীতিক প্রতিবেশের সম্বন্ধে সমালোচনা দেখা গেল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যদিয়ে মঞ্চ দেশাত্মবোধের প্রবেশ ঘটেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দুমেলা অনুপ্রাণিত। তিনি “জাতীয় চেতনার আবেগ।”^{১২} ঢেলে দিয়ে ‘পুরুবিক্রম’ নাটক গড়ে তোলেন। নাটকের উদাসিনী গায়িকার মুখে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান মিলে ‘সব ভারতসন্তান’-এর প্রয়োগ স্বদেশচেতনাকে তুলে এনেছিল।

আগেই বলা হয়েছে সাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে নাটক প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী মাধ্যম। নাটক সমাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং বিশেষ ভাবে তৎকালীন বা সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। বাংলা নাটকের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই এই প্রতিবাদ বিষয়টি লক্ষিত হয়। সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন ক্ষতিকর নিয়ম, রীতি বা প্রথা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয় প্রতিবাদের; সময় ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যার উৎপত্তি। এই সময় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা নাটকে দেখা যায় প্রতিবাদের বিবর্তনের ধারা।

প্রতিবাদ সমাজের কোন সমস্যা বা কোন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হতে পারে, রাজশক্তির শোষণ বা কোন বঞ্চনার বিরুদ্ধে হতে পারে; কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিরুদ্ধে হতে পারে অথবা কোন বৈষম্য বা কোন অনাচারকে কেন্দ্র করেও সংঘটিত হতে পারে। এছাড়াও আরো নানা প্রকার কারণে প্রতিবাদ সংঘটিত হতে পারে।

বাংলা নাটকের উৎপত্তিকাল থেকেই বিভিন্ন নাটকে নানাভাবে প্রতিবাদের রূপ ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তু নির্মাণে সংলাপ ও ভাষার ব্যবহারে টোন বা বলার ভঙ্গিতে অথবা ব্যঞ্জনার দ্বারা বাংলা নাটকে প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটেছে। বাংলা নাটকগুলির মধ্যে প্রতিবাদের বিভিন্ন ধরণ

কীভাবে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলছে তা বিশ্লেষণ করবার জন্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হল। প্রতিটি পর্বের কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই প্রতিবাদের রূপ বিশ্লেষণ করা হল।

বাংলা নাটকে আদি পর্ব (১৭৯৫-১৮৭২) : এই পর্বে আলোচিত নাটকগুলি হল— যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত- ‘কীর্তিবিলাস’ (১৮৫২), রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত— ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত— ‘বিধবা বিবাহ’ (১৮৫৬), দীনবন্ধু মিত্র রচিত— ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০), মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত— ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০), ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌঁ’ (১৮৬০), মীর মোশারফ হোসেন রচিত— ‘জমিদার দর্পণ’ (১৮৭৩)।

প্রথমে সংস্কৃত নাটকের রীতিকে অনুসরণ করেই বাংলা নাটকের সূচনা হয়। তারপর ধীরে ধীরে যখন মৌলিক বাংলা নাটক রচিত হতে শুরু করে তখন থেকেই আরম্ভ হয় বাংলা নাটকের প্রতিবাদের পদযাত্রা। তৎকালীন অর্থাৎ বাংলা নাটকের আদি পর্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে যে সকল বাংলা নাটক রচয়িতার আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের নাটকে সমাজের নবজাগ্রত ভাবতরঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়েছিল। সমাজব্যবস্থায় নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক নাটক এবং নক্সা। সামাজিক অসংগতির পাশাপাশি শোষণ, ব্যঞ্জনা, বৈষম্য এসব বেদনাদায়ক বিষয়গুলিও সমাজ সচেতন, মননশীল নাট্যকারদের হৃদয়কে স্পর্শকাতর করে তোলে। উল্লিখিত নাটকগুলির ক্রমশ আলোচনার মাধ্যমেই উক্ত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাংলা নাটকে শুরুর দিকে রচিত নাট্যকার যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তি বিলাস’ (১৮৫২ খ্রী.) নাটকটির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে চলার প্রয়াস। শাস্ত্রের আনুগত্য এবং ধর্মের মোহ থেকে মুক্তি লাভ করে জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি দানের মাধ্যমে বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশ ঘটানো। সংস্কৃত নাটকের শাস্ত্র প্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। মিলনাস্তক নাটকের বন্ধনকে ছিন্ন করে স্বতন্ত্র ভাবে বিয়োগান্তক নাটকের প্রতিষ্ঠা করা। যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকটিই হল বিয়োগান্তক নাটকের প্রথম পথ প্রদর্শক।

‘কীর্তিবিলাস’ নাটকে বাঙালি পরিবারের স্ব-পত্নী সমস্যা ও বিমাতার অন্যায়ে ব্যবহার ইত্যাদি সমাজসমস্যা ট্রাজেডির আদলে পরিবেশিত হয়েছে। নাট্যকার “ট্রাজেডি লিখবার চেষ্টা করলেন। যে দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এ জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ সে দেশে এরূপ সাহসিক চেষ্টার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।”^{১০} ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকে এমন দুটি বিষয়

এসেছে যাকে তখনকার পক্ষে বৈপ্লবিক বলা যায়। প্রথমত ট্রাজেডি লেখার সিদ্ধান্ত। সংস্কৃত নাটকের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে ট্রাজেডি লেখার জোর তিনি ইংরেজি নাটক থেকেই পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বপত্তী সমস্যা ও বিমাতার অন্যায় আচরণের যে দিকটিকে তিনি ট্রাজেডির কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তারও গভীরে আর একটি ট্রাজেডি নিহিত আছে। বৃদ্ধের তরুণীভার্যা স্বামী সুখে বঞ্চিত হবার ফলেই পুত্র স্থানীয় যুবকের প্রতি তাদের আকর্ষণ জন্মে। এ এক সর্বকালের মানবিক সমস্যার প্রশ্ন। ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকে লেখক একেই তুলে ধরেছিলেন। কাজেই বাংলা নাটকের একেবারে আদিপর্বেই একটা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল।

বাংলা নাটক অনুবর্তনের সোজা রাস্তাটি ছেড়ে যেদিন সৃষ্টির জটিল পথে চলতে আরম্ভ করল সেদিন থেকেই সমাজের ভাববিপ্লব তার অন্তর্দেশ আলোড়িত করে তুলল। সমাজে বিভিন্ন প্রকার জাগ্রত মানস চেতনার গতি ও সংঘাত বাংলা নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠল। বাংলার সমাজ ধর্ম ও রাজনীতির এই ভাবাপ্নত অবস্থায় আদিপর্বের বাঙালি নাট্যকারদের আবির্ভাব হয়েছিল। সে কারণে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের নবজাগ্রত চেতনার ভাবতরঙ্গ তাদের নাটকের মধ্যে সংক্রামিত হল। সে সময়ে যে সামাজিক আন্দোলনটি বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল সেটি হল ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন এই আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বে। প্রথম পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন উমেশ চন্দ্র মিত্র। তাঁর রচিত ‘বিধবা বিবাহ’ (১৮৫৬) নাটকটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

‘বিধবা বিবাহ’ নাটকটিতে নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যরীতি বর্জন করেছেন। এই নাটকটি একটি করুণ রসাত্মক রচনা। এতে বাস্তব জীবন সমস্যার করুণ পরিণতি দেখানো হয়েছে। বিধবা বিবাহ নাটকের কাহিনীতে দেখতে পাই বালবিধবা সুলোচনার অন্তরে কাম ভাব জেগে ওঠে। সে গ্রামের এক যুবক মন্মথের রূপে আকৃষ্ট হয় এবং গোপনে মিলিত হয়। ফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়। কিন্তু রক্ষণশীল পিতৃপরিবারে সে কলঙ্কিনী হিসেবে চিহ্নিত হল। শেষ পর্যন্ত কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সুলোচনা বিষ পান করে আত্মহত্যা করল। নাট্যকার এ নাটকে নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পূর্ণ ও উচিৎ-অনুচিতের সীমারেখাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং নিরপেক্ষ মানবীয় রসের উৎসার ঘটিয়েছেন।

‘বিধবা বিবাহ’ নাটকের বিষয়টি কোনো ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক পদস্থলনের কাহিনী নয়। এ একটা সামাজিক সমস্যা। অনেক দিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁর বামুনের মেয়ে’র কাহিনীতেও এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। সুলোচনা সেই বিধবা শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু সুলোচনার

মৃত্যুর দুঃখ বর্ণনাই যদি এ নাটকের উদ্দেশ্য হত তবে তা এক করুণ রসের নাটক হিসেবেই পরিগণিত হত। নাট্যকার তাতেই থেমে থাকেননি। বিধবা বিবাহ যে সমাজ স্বীকার করে না সেই সমাজের প্রতি অভিযোগের আঙুল তোলাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। নিছক সমাজ সংস্কার নয় যে জড় স্থবির সমাজ চিন্তার দিক থেকে প্রথাবদ্ধ, বাস্তবজীবনবোধ হীন নাট্যকার তার প্রতি এক জোরালো প্রতিবাদী স্বর এ নাটকে উচ্চারণ করেছেন।

কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪) বাংলার সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম সত্যিকারের সাহিত্যিক প্রতিবাদ। এর আগের কোনো নাটকে কিংবা অন্য কোনো সাহিত্যিক রচনায় এরকম বলিষ্ঠ প্রতিবাদের উচ্চারণ নেই। রামনারায়ণ নিজের কোনো প্রকাশ বাসনা বা প্রতিবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ নাটক লেখেননি; তিনি অপরের অনুবন্ধে, ঘোষিত পুরস্কারের কথা মনে রেখে এ নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু সমাজের এই কু-প্রথার প্রতি নিশ্চয় তাঁর বিরাগ ছিল আন্তরিক। রামনারায়ণের এ নাটকটি রচনা হিসেবে খুব উৎকৃষ্ট কিছু নয়। বাংলা চলিত গদ্যের শক্তিও তখন পরীক্ষিত হয়নি। সাধুগদ্য সংলাপ, গদ্য-পদ্যময় সংলাপ, যথার্থ plot রচনার অক্ষমতা, নাটকের কাহিনি রচনার অপারগতা, প্রকৃত নাট্যসংঘাতের অভাব-এসব সত্যেও রামনারায়ণ যে বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলেন, তা সেকালের একটা প্রথাকে আঘাত করতে পেরেছিল। নাটক রচনা যে কেবল বিনোদনকেন্দ্রিক হবে না, তা সমাজ সচেতন একটা শিল্পকর্ম ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একথা তাঁর আগে বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। রামনারায়ণ ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ লিখেছিলেন, ক’বছর পরে ‘নবনাটক’ লিখলেন এবং অত্যন্ত সচেতনভাবে বাংলা সমাজের দুটি রীতিকে আঘাত করলেন। এই কাজে বিষয় তাঁর প্রধান অস্ত্র, শ্লেষ পরিহাস তাঁর অন্যতম উপায়। সমাজতাত্ত্বিক গবেষকের মতো কৌলিন্যের নানা দিক তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, কুলীনের বহু বিবাহ মাত্র নয়-নানা দোষের রূপচিত্র এঁকেছেন-কন্যা বিক্রয়, বিবাহ বাণিজ্য, ব্যাভিচার দোষ-সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নাটকে তুলে এনেছেন। তিনি যে সব তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তার কোনটাই কাল্পনিক নয়। - বস্তুত “কুলীন কুলসর্বস্ব” সেকালের সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে।”^{১৪}

কৌলিন্য প্রথার বহুখা বিচিত্র বিকৃতির কুফলকে তিনি একটি উদ্দেশ্যের সূত্রে গ্রথিত করে বর্ণাঢ্যমালিকা তৈরি করেছেন। কুলপালকের চার কন্যার বিবাহ সমস্যা, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ ঘটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, অকুলীন পাত্রের বিবাহ সমস্যা, পতি সংসর্গ বঞ্চিত কুলীন পত্নীর যৌবন যাতনার ফলে ব্যাভিচারগামিতা ও অবৈধ সন্তান লাভ, অর্থের লোভে কুলীনের সেই সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করা, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রীর -আচার, স্বৈরিণী নারীর জীবনচিত্র, আচার ধর্মের নামে

অমানবিকতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ রামনারায়ণ এই নাট্য পটভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের শেষে নটের 'হরিবোল' ধ্বনি উচ্চারণের মধ্যদিয়ে সমাজ সচেতন, নাট্যকার রাম নারায়ণ তর্করত্ন কৌলিন্য প্রথার প্রতি তাঁর খিকার এবং এরকম বিবাহের পরিণতি কি হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকে রামনারায়ণ ধর্মশীলের অসহায়তার দিকটিও পরিস্ফুট করে তুলেছেন। প্রথমে শুভাচার্য পরে ধর্মশীল -এই দুটি চরিত্রের মধ্যে তিনি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অসহায়তা দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখতে পাই শুভাচার্য অন্তাচার্যের মূর্খতা বুঝতে পেরেও কিছু বলতে পারেননি। "এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য নাই—ইহার মতের অন্যথা कहিলে উত্তম মধ্যম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ...অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত।"^{১৫} ষষ্ঠ অঙ্কে অভব্যচন্দ্রের সঙ্গে একত্র থাকা অসম্ভব বুঝে ধর্ম শীলও চলে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত ধর্মেরও পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে অধর্মভাব জাগে তা রামনারায়ণ দেখিয়ে দেন। ধর্ম শীল বলে "অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে তাহার ভালো মন্দ আমার বিবেচনায় কার্য কি? আমি ত দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা হলেই হলো।"^{১৬} রামনারায়ণ একদিকে যেমন কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তেমনি মিথ্যাচার অশুভবুদ্ধি এবং অভব্যতার সম্বন্ধেও একটা 'চেতাবনি' দিয়েছেন। কেবল কৌতুক বিদ্রূপ শ্লেষ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি।

বাংলা নাটকের আদিপর্বে বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথাকে আঘাত করবার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার মতো বিষয় সম্বন্ধেও কলম ধরেছেন। যে কয়েকজন নাট্যকার এরকম শোষণ পীড়নের বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনিই এ বিষয়ে অগ্রপথিক। কিন্তু অন্যদের লেখা নাটকে সমাজের এই দিকগুলি অর্থনৈতিক সামাজিক পীড়নের চিত্ররূপ ভালোই ফুটেছে। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন উপস্থাপিত করবার সময় কাউন্সিলের ল' মেন্সার হবস হাউস 'চাকরদর্পণ' নাটকটির কথা উল্লেখ করে শাসকশ্রেণীর তদানীন্তন শোষণ পীড়নের নীতিটিকে আড়াল করতে চেষ্টা করেছিলেন। 'জমিদার দর্পণ' এতোটা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে ভাবায়নি। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ভাবিয়েছিল। 'নীলদর্পণ', 'চাকরদর্পণ' -এসব নাটকে কেবল সামাজিক পীড়ন নয় রাজ্য শাসকের শোষণের প্রতিবাদও করা হয়েছিল। এজন্য 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুবাদকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে 'চাকরদর্পণ' -এর উল্লেখ থাকে।

নীলচাষকে কেন্দ্র করে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামকে প্রকট করে তোলা হয়েছে 'নীলদর্পণ' নাটকে। এ নাটকের মাধ্যমে ইংরেজ নীলকরদের

অত্যাচারের ছবি যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনটি আর এই পর্বের কোনো নাটকে হয়নি। কিন্তু ‘নীলদর্পণ’ শুধু নীলকরদের পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয় সমগ্র শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ইতিহাস সচেতন নাট্যকার দীনবন্ধুমিত্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। আবার ঈশ্বরগুপ্তের পাঠশালায় স্বদেশী ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে কেবল পৌরুষে বা বিপ্লবে নয়, দেশের সার্বিক মুক্তি আনতে হলে চাই জাতির মানস মুক্তি। দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হবে, শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হতে হবে। তাই তিনি জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের বিচিত্র মুখী জীবনসাধনার আধার করে সৃষ্টি করেন ‘নীলদর্পণ’ নাটক।

“নীলদর্পণ জাতির সঠিক কর্মপথের নির্দেশক এক দিগদর্শিনী। জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণায়ত জীবন বিকাশের যে স্বদেশিক চিন্তা ‘নীলদর্পণে’র মধ্যে অনুসূত তা পরবর্তীকালের জাতীয়তা বোধকেও বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে- এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।”^{১৭}

‘নীলদর্পণ’ নাটক অবলম্বন করে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধের সূচনা হয়। নাটকটিতে শ্বেতাঙ্গ নীলকর বর্বদের অত্যাচারের বীভৎস রূপ উদ্ঘাটিত হয়। জাতিবর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছিল। ‘নীলদর্পণ’ নাটকে রয়েছে জীবন সত্যের রূপায়ণ। “ ‘নীলদর্পণ’ নিঃসন্দেহে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছিল।”^{১৮} উদ্দেশ্যকে সাহিত্যরসে আবৃত রেখেই নাট্যকার কয়েকটি চরিত্রে রূপসৃষ্টির যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাতে জীবন সত্যের পরিচয় বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে। তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি চরিত্র এদের মধ্যে অন্যতম।

তোরাপ চরিত্রটি নীলকুঠিতে আবদ্ধ থেকেও মনের শক্তিতে সে অনমণীয়। রোগ সাহেবের কামরা হতে ক্ষেত্রমণি উদ্ধার -দৃশ্যে তার বলিষ্ঠতা, বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলার জীবন্ত প্রতিমূর্তি তোরাপ বলিষ্ঠ প্রাণের শক্তিতে ও অনমনীয় সংকল্পে এক সার্থক চরিত্র।

আদুরী চরিত্রটি পরিচারিকা হলেও বসুপরিবারের সঙ্গে তার আত্মীয়তার বন্ধন। ক্ষেত্রমণির প্রতি ছোট সাহেবের কু-নজর পড়ায় ঘৃণার সঙ্গে সে জানায় “সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গন্দো থু-থু।”^{১৯} ক্ষেত্রমণি পল্লী বাংলার কুলবধু। সে উড সাহেবের অন্যায় প্রস্তাবকে প্রশ্রয় দেয়নি। বরং তার প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছে। “ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী খোড়া মরা মর্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচড়ে কেম্ড়ে টুকরো টুকরো করব,”^{২০}

তোরাপ, আদুরী ও ক্ষেত্রমণি এরা যে অগণিত গ্রামবাংলার শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি। এদের মধ্যেই সংগঠিত হয়ে উঠেছে শাসক শক্তির শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ‘নীলদর্পণে’ প্রথম শ্বেতাঙ্গ সুবিধাভোগী শোষকশ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটিত হল। কিন্তু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ তখনো অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। এজন্য নীলপর্দণের অভিনয়ই হল বহু পরে, যদিও গিরিশচন্দ্র এজন্য দীনবন্ধুকে সাধারণ রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ‘নীলপর্দণে’র প্রতিবাদী গুরুত্ব প্রথম যুগে বাঙালী নাট্যমোদী জনসাধারণের চোখে পরিস্ফুট হয়নি। সাধারণ বঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হল ‘নীলদর্পণ’ নাটক দিয়ে। কিন্তু শৈথীন নাট্যমোদীদের কাছে তা অভিনয়ের সুযোগ পায়নি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০) প্রহসনটিতে “ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রষ্টাচার তরুণ যুবকদের কাদাচারকে শানিত রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় দারুণ কষাঘাত করা হয়েছে।”^{২১} বৈষ্ণব ভক্তের পুত্র নবকুমার ও তার বন্ধু কালীনাথ দু’জনেই তারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজেদের তারা কুসংস্কার বর্জিত সভ্য-যুবক বলে ভাবে। অথচ মদ্যপানে ও তামাক সেবন ও নারীসঙ্গ লাভই তাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার চর্চার বিষয়। কামিনীদের কথাতেই এদের চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় — “বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। মদ্য মাংস খেয়ে ঢলাঢলাি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?”^{২২} একথার মাধ্যমে বোঝা যায় তৎকালীন মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায়ের বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে নাট্যকার খিক্কার জ্ঞাপন করেছেন। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে কিছু সংখ্যক যুবকের এই নষ্টচরিত্রের প্রতি প্রতিবাদ দানা বেঁধেছে এই প্রহসনটিতে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’তে (১৮৬০) “তথাকথিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজপতির কু-চরিত্র ও লাম্পাট্য খুব রসালো ভাবে বর্ণিত হয়েছে।”^{২৩} গ্রাম বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধ সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন কীভাবে অনাচার করে চলেছে তারই জ্বলন্ত নজির এই প্রহসনটি। তৎকালীন সমাজ, ব্যক্তি, তাদের নীতিভ্রষ্টতাকে নাট্যকার কৌতুক ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মধুসূদনের এই প্রহসন দুটির একটিতে আধুনিক যুক্তিবাদী তরুণ সমাজ অপরটিতে প্রাচীনপন্থী ভণ্ডদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষণীয় যে এই দুটি প্রহসন বাংলা নাটকের ভালো রচনা হলেও এদের অভিনয় কিন্তু অনেক পরে হয়েছে। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র অভিনয় ১৮৬৫ সালে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে প্রথম অভিনীত হয়। ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ আরও পরে, ১৮৬৭ সালে কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়ির মঞ্চে অভিনীত হল। প্রহসন

দুটি অভিনীত না হবার ফলে মধুসূদন অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালী সমাজে যে এই প্রহসন দুটি গ্রাহ্য হয়েছিল তা পরবর্তীকালে অভিনয়ের ধারা দেখে বোঝা যায়।

মীরমোশারফ হোসেন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে ‘জমিদার দর্পণ’ (১৮৭৩) নামে একটি বাস্তব ধর্মী নাটক লেখেন। দীনবন্ধু মিত্র যেমন নীলকর সাহেবদের স্বরূপ তুলে ধরলেন ‘নীলদর্পণ’ নাটকে, ঠিক তেমনি জমিদার প্রথা উদ্ভবের সময় থেকে প্রজাদের প্রতি জমিদারদের নানা প্রকার শোষণ অত্যাচারের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন এ নাটকে। লম্পট জমিদারের পাশবিক দিকটিকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে গান ও সংলাপের মাধ্যমে। আসলে “জমিদার সমাজের অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য নাটকখানি রচিত।”^{২৪}

আদি পর্বে আলোচিত এই বাংলা নাটক গুলিতে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। সেই সামাজিক সমস্যা কখনো কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্বপত্নী সমস্যা আবার কখনো মদ্যাসক্তি, ললনাসক্তি জনিত কারণেও সৃষ্টি হয়েছে। কেবল মাত্র ‘নীলদর্পণ’ ও ‘জমিদার দর্পণ’ নাটক দুটিতে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে বা শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। আর ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকে রয়েছে মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াস বা প্রচলিত নাট্যধারার বাইরে স্বতন্ত্র নাট্যধারার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সুতরাং উৎপল দত্তের মতানুসারেই বলা যায়—“উনিশ শতকের বাংলা নাটকের গোড়ার দিকে বেশির ভাগ নাটকেই ছিল সমাজ সমস্যা ও সংস্কারের কথা। এবং তাতে নাট্যকারদের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল তা মূলত দেশের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।”^{২৫}

গিরিশ—দ্বিজেন্দ্র পর্ব : এই পর্বের সময়কাল মোটামুটি নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রচলিত হওয়ার প্রাক মুহূর্ত থেকে অর্থাৎ ১৮৭৩ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ সময়ে নাট্যকারদের সমাজ চেতনা জাতীয়তার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে তাই নাট্যকারদের নাট্যকাহিনী স্থানান্তরিত হয়ে যায় ঐতিহাসিক পরিবেশে। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতে বাংলার জনমানসে জাগৃতি লক্ষিত হয়। এ জাগৃতি দেখা যায় যেমন সমাজবিপ্লবে তেমনি দেখা যায় সম্মিলিত জাতীয় চেতনায়।

যেসব নাট্যকার জাতীয়তাবোধ দ্বারা প্রভাবিত হলেন তাঁরা দেশের হতগৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে নাটক রচনা করলেন। জাতীয়তার পাশাপাশি সে সময়ের নাটকে অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যাকে বলা যেতে পারে রোমান্টিকতা। পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে এসব নাটকে দেখানো হয়েছে একটা সামাজিক বিপ্লব। নারী পুরুষের মধ্যে সাম্য

প্রতিষ্ঠা, সমান অবস্থা, সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যার অন্যরূপ জাতীয়তা এবং অপর দিকে রয়েছে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নিম্নলিখিত নাটকগুলিকে কেন্দ্র করে এ পর্বের আলোচনা করা হল। উপেন্দ্রনাথ দাসের—‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ (১৮৭৫), গিরিশ চন্দ্র ঘোষের- ‘সিরাজদৌলা’ (১৯০৬) ও ‘মীরকাশিম’ (১৯০৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের- ‘মেবার পতন’, ‘প্রতাপ সিংহ’, ‘সাজাহান’ ও ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের- ‘আলমগীর’ ও ‘বঙ্গের প্রত্যাশাদিত্য’।

জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত ও প্রণয়মূলক একটি সামাজিক নাটক উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ (১৮৭৫)। সে সময়ে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে ইংরেজ বিদ্রোহী ও স্বদেশ হিতৈষী মনোভাব জেগে উঠেছিল নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্যে সে বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। “তাঁর দু’খানি নাটক এক সময়ে অভিনয়ে প্রবল উত্তেজনা ও ইংরেজ বিদ্বেষ সঞ্চারণ করেছিল। লোমহর্ষক ঘটনা, পিস্তল ছোড়াছুড়ি, খুনখারাবি, ডাকাতি, গোরাপ্রহার, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর যথোচিত শাস্তিবিধান প্রভৃতি উত্তেজক ঘটনা এর প্রধান অবলম্বন।”^{২৬} এ দুটি নাটকের মধ্যে একটি ‘শরৎ-সরোজিনী’ এবং অপরটি হল ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’।

‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ নাটকের সব থেকে বাস্তব ও আকর্ষণীয় বিষয় হল হুগলীর মেজিস্ট্রেটের ঘটনা টুকু। সুরেন্দ্রর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বন্দ্ব হয়। সুরেন্দ্র প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্প হয়। হুগলীর সাধারণ উদ্যানে যেদিন ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেগেল্ সুরেন্দ্রকে চাবুক মারল, সেদিন “সুরেন্দ্র চাবুক কাড়িয়া লইয়া ম্যাক্রেগেল্কে পদাঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া চাপকাইয়া দিল।”^{২৭} আবার সুরেন্দ্রের অসুস্থতার সুযোগে ম্যাক্রেগেল্ বিরাজমোহিনীর স্ত্রীলতা হানির চেষ্টা করে। নাটকের একটি দৃশ্যে লম্পট সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নায়িকার ওপর অত্যাচারের দৃশ্য ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে^{২৮} ১৮৭৩ সালে নাটকটির অভিনয় চলাকালে, পুলিশ নাটকের মধ্যে সিডিশনের আঁচ পেয়ে অস্বীকৃতির অভিযোগ এনে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করল। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু করল। এ নাটকে রয়েছে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়াস। সকুমার সেনের ভাষায়—“উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা নাট্যরচনায় বিপ্লব ঘটাইলেন দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টায় খুন-জখম-লাঠালাঠি ও ইংরেজ-বিদ্বেষের মশলা জোগাইয়া। বলিতে গেলে উপেন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্রাইম-কাহিনীকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন।”^{২৯} উপেন্দ্রনাথের নাটকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে কণ্ঠস্বর শোনা গেল তা আরও স্পষ্ট হল ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ এবং ‘দি পুলিশ অব পিগ অ্যাণ্ড শিপ’ প্রহসনে। এ দুটি নাটকের শাসক বিরোধী চরিত্র অতিশয় স্পষ্ট।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। সে সময়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বেশ কয়েকটি মঞ্চ সফল পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকও লেখেন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে নাটকের গতি প্রকৃতি ভিন্ন পথে চালিত হয়। পৌরাণিক জগৎ থেকে নাটকের ভিত্তিভূমি স্থানান্তরিত হল ঐতিহাসিক জগতে। এসময়ে রচিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক হল ‘সিরাজদৌল্লা’ (১৯০৬)। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তির উপরেই এই নাটকটি লিখিত হয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিমণ্ডলে সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে যে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, কবি, সাহিত্যিক নাট্যকারগণ তাতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তাপের স্পর্শ পেয়েছিলেন। তাঁর স্বাদেশিক অনুরাগ বা জাতীয়তাবোধের অন্যতম ফসল এই ‘সিরাজদৌল্লা’ নাটকটি। নাটকের ঘটনা শুরু সিরাজদৌল্লার সিংহাসন প্রাপ্তির সময় থেকে আর সমাপ্তি ঘটে সিরাজের শোচনীয় পরাজয়ের পর সেনাপতি মীরজাফরের সিংহাসনে বসার ঘটনায়। নাটকে সিরাজ চরিত্রটিকে আমরা একজন স্নেহশীল স্বদেশ বৎসল নবাব রূপেই দেখতে পাই। ‘উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্ৰীতি ও সুতীর ইংরাজ বিদেঘ তাঁহার চরিত্রকে গভীরভাবে জাতীয়তায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।’^{১০}

সিরাজ চরিত্রটিই এ নাটকের উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্র। নাট্যকার সরাসরি এ চরিত্রের মাধ্যমে পরাধীনতার আন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করেছেন। ‘নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল এই নাটকে সমসাময়িক জাতীয়তার ভাব সঞ্চার করা, সেজন্য তিনি সিরাজ চরিত্রকে যেমন বীররূপে দেখিয়েছেন তেমনি কাল্পনিক চরিত্রেরও উপস্থাপনা করেছেন।’^{১১} পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করবার জন্য তিনি আশ্রয় চেপ্টা করেছেন। দেশীয় ঐতিহাসিকদের লেখায় সিরাজ দেশ ভক্তরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সিরাজকে স্বাদেশিকতার মূর্ত প্রতীক রূপে চিত্রিত করেছেন। দেশকে ভালোবেসে দেশের আপামর জনগণের প্রতি তিনি বিশ্বাস রেখেছেন। তাঁর সভাসদ-পারিষদ সকলের প্রতি আস্থা ছিল। বিদেশী শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য তিনি সকলের সহযোগিতার প্রার্থী। নাটকে দেখা যায় বিদেশী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের বিদেঘ বর্ষিত হয়েছে।

‘শত্রুগুণে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বর্থপর চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।’^{১২}

এসব উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পরাধীন ভারতবাসীকে

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস। ‘সিরাজদৌল্লা’ ছাড়াও এ নাটকের জাতীয়তা বোধের পরিচয় বাহী অন্যদুটি চরিত্র হল জহরা ও করিম চাঁচা। জাতীয়তাবাদের প্রচারের জন্যই ১৯১১ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী সরকার এ নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল।^{১০০}

‘সিরাজদৌল্লা’ নাটকের মতো ‘মীরকাশিম’ (১৯০৬) নাটক রচনার পিছনেও ছিল নাট্যকারের স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ। ব্রিটিশ বিরোধিতা, স্বদেশী গ্রহণ- বিদেশী বর্জন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদকে দূর করে সম্প্রীতির আহ্বান ঘোষিত হয়েছে এ নাটকে। “ইতিহাস আশ্রিত এই নাটকে মীরকাশিমকে জাতীয় বীর চরিত্ররূপে নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং কিছু পরিমাণে সার্থক হয়েছেন।”^{১০১} সিরাজের তুলনায় মীরকাশিম চরিত্রটি আরও বেশি বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী। আর সে কারণেই নাট্যকার স্বদেশী যুগের জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে ‘মীরকাশিম’ নাটকে মীর কাশিম চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

উনিশ শতকে বাংলার জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে হিন্দুর গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও সার্বভৌম ধর্মবোধকে অবলম্বন করে উন্মোচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি স্থাপন করবার জন্য কোন প্রয়োজন সে সময়ে অনুভূত হয়নি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘ছত্রপতি শিবাজী’ (১৯০৭) নাটকটি তার অন্যতম প্রমাণ। এ নাটকে “শিবাজীর চরিত্রের ঐতিহাসিক দিকটি নাট্যকারের আদর্শ জাতীয় ভাবধারার ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। এই আদর্শ হল ধর্মভাষিত জাতীয়তার সাধনা।”^{১০২} আর সে কারণেই দেখা যায় নাটকের জাতীয়তা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ইত্যাদি ধারণা সঞ্চারণ করবার পাশাপাশি শিবাজী চরিত্রটি ভবানীর সন্তান এ পৌরাণিক অনুষ্ঙ্গটিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন নাট্যকার। হয়তো সে জন্যই ইতিহাস সমর্থিত শিবাজীর চরিত্রের অসাম্প্রদায়িক রূপকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেননি। “স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয়তাবোধের একটা ধারা যে ধর্মাশ্রিত পথে প্রবাহিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য মেলে এই নাটকে।”^{১০৩} এছাড়াও জাতীয় আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করবার প্রবণতা রয়েছে এ নাটকে।

বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় ‘বঙ্গভঙ্গ বিরোধী’ আন্দোলনকে অবলম্বন করে। বঙ্গদেশ এই প্রথম সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে মিলনের ভিত্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে সার্থকতা লাভে সচেষ্ট হয়েছিল। এ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লিখলেন তার মধ্যে একটি অন্যতম হল ‘প্রতাপ সিংহ’ (১৯০০)। “স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাহ্যত ইহার নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের আদর্শ অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথম যে নাটকখানি রচনা করেন তাহাই ‘প্রতাপ সিংহ’।”^{১০৪} রাজ্যহারা

রানা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সংকল্প থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দীর্ঘ সময়ের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এতে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রতাপ সিংহের শৌর্য, দেশপ্রেম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমাময় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। প্রতাপের সংগ্রামশীলতা ও দুঃখ বরণের কাহিনী সে যুগের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন শক্তসিংহ ও দৌলত উল্লিসার পরিণয়ের মাধ্যমে। রাজপুত রমণীদের তেজস্বিতা ও বীরত্বের মাধ্যমেও নাট্যকার স্বদেশী আন্দোলনের দিকটি তুলে ধরেছেন। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে নাট্যকারের প্রতিবাদ কম, শ্রমে ও শক্তিতে হাত রাজ্য এক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বেশি। নাটকে প্রতিবাদের কথা এক ভাবে আছে মনে করা যায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতাপসিংহের কন্যা ইরার মুখ দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মত ব্যক্ত হয়েছে। মেহের হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বিরোধ এবং নারীর মর্যাদার কথা বলে। এগুলি ঠিক প্রতিবাদ নয় নাট্যকারের মত প্রতিষ্ঠার কথা। ‘প্রতাপসিংহ’ বঙ্গভঙ্গ যুগের অগ্নিগর্ভ পরিবেশে লেখা লেখকের জাতীয় ভবিষ্যৎ চিন্তার নাটক। প্রতাপ চিতোর উদ্ধার করতে পারেননি, বঙ্গভঙ্গ পর্বে বঙ্গবাসীও ১৯০৫ সালে বাংলাভাগের চক্রান্তে আক্রান্ত হয়েছে। আকবর শাহের মুখে সেখানে প্রতাপের প্রশংসা শোনানো হয়েছে। বিজিতের যে আত্মমর্যাদা একেবারে নিঃশেষিত, বিজয়ীর মুখে যদি সেই জাতির মহত্ত্বের প্রশংসা করা হয় তাহলে তা যেমন পরাজিত জাতির আত্মপ্রসাদের কারণ হয় অনেকটা সেই কাজ হয়েছে আকবরের মুখে প্রতাপের প্রশংসায়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই আত্মমর্যাদা উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন প্রতাপসিংহ নাটকে; তার প্রতিবন্ধকতার আলোচনা করেছেন।

‘মেবার পতন’ (১৯০৮) এর তিন বছর পরে লেখা এ নাটকের মধ্যেও নাট্যকার পরাজিত জাতির গৌরবহীনতার কারণ সন্ধান করেছেন। রানা প্রতাপ দীর্ঘদিনের যুদ্ধে মেবারের যে অংশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন, প্রতাপের পুত্র অমর সিংহের সময়ে সে অংশটুকুও কীভাবে মোঘলদের অধিকারে চলে গেল সে কথাই বর্ণিত হয়েছে ‘মেবারপতন’ নাটকে। রাজপুত জাতির ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও স্বজাতিদ্রেষকে মেবার রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্বজাতি বিদ্রেষই সে জাতির ধ্বংসের মূল কারণ তা মহাবৎ খাঁর বাক্য ও আচরণে সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের দিকটা যখন ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ঠিক সে সময়েই দ্বিজেন্দ্র লাল জাতীয় মিলনের কল্যাণকর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন ‘মেবার পতন’ নাটকে। নাট্যকার এক উদার সাম্যমূলক মহানীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এ নাটকে। তিনি নিজেই এই নাটকের ভূমিকায় বলেছেন—“এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম।”^{৩৮} তবে তিনি কাহিনী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে

স্বদেশ প্রীতিকেই মূল ভাব রূপে গ্রহণ করেছেন।

‘সাজাহান’ (১৯০৯) নাটকের বিষয় ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম এবং রাজ্যাধিকার লাভ। এ নাটকে স্বাভাবিক ভাবে যদি কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কথা থাকে তবে তা এই ভ্রাতৃদ্রোহ-পিতৃদ্রোহ সম্বন্ধে থাকবে। নাট্যকার ঔরঙ্গজেবের নীচতা, রাজ্যলোভে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান লোপ—এসবই দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে একান্ত মানবিক সম্পর্কের ক্ষয়, পিতা-পুত্র সম্পর্কের ভিতরে স্বার্থ, লোভ প্রবেশ করবার বিষময় পরিণতিই এখানে দেখানো হয়েছে। তা মানবিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নাট্যকারের একটা ধারণার প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু এই নাটকের সময় তো বাংলাদেশের স্বদেশী যুগ-বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল। কাজেই দ্বিজেন্দ্রলাল এ নাটকে সাজাহান, জাহানারা চরিত্র দুটিকে এই জাতীয়তা উদ্দীপণের কাজে লাগিয়েছেন। সেসময় জাতীয়তাবাদ জাগানোর জন্য যেরকম আবেগদীপ্ত ভাষণ ব্যবহার করা হত সেইরকম বক্তৃতা, ভারতবর্ষের পরাধীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ, কোনো কোনো যুদ্ধের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতি ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্তির উপায় নেই দেখে-ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা—এসব এ নাটকের জাতীয় ভাব জাগানোর পটভূমি রচনা করেছে। জাহানারার সংলাপে ভারতবর্ষের পরাজিত হীন অবস্থার কথা বলা এবং তার দ্বারা দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জন এবং আবেগমথনের কাজ বেশ হয়েছে। “জাহা।। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে।”^{৩৯} আবার “জাহা।। ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলছে।”^{৪০} ঐ জাহানারার সংলাপেই আজ ভারতের তপোবনযুগের কথা—“বিজয়দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে।”^{৪১} এই ধরণের উক্তিতে ইংরেজ শাসনের সম্বন্ধে পরোক্ষ কটাক্ষ, সুজার স্ত্রী পিয়ারার সংলাপে বঙ্গভূমির প্রশংসা “চেয়ে দেখ এই শস্যশ্যামলা পুষ্পভূষিতা সহস্র নির্বারমন্দৃত অমরাবতী-এই বঙ্গভূমি”^{৪২} এসব দর্শক শ্রোতার মনকে কিছুটা তৃপ্তি দিত-তাদের মনকে একটু হলেও ইংরেজদের সম্বন্ধে সচেতন করত। ‘রানা প্রতাপসিংহ’ নাটকে তিনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উপরে উঠে একটা ঐক্য যে দেশের জন্য দরকার, তা কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে কোনো কোনো চরিত্রের কাজে তুলে দেখিয়েছেন।

হিন্দুযুগের বিষয়কে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম যে নাটকটি লিখেছেন সেটি হল এই ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১) নাটক। এ নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল যুগলক্ষণ। নাটকের মধ্যে সেকেন্দার শাহ্ ভারতে যে প্রকৃতি-স্তব করেছেন তাতে ভারত মাতারই বন্দনা করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এর আগে ‘নূরজাহান’ নাটকের প্রথম অঙ্কে বঙ্গবন্দনা করেছেন, পরে সাজাহান নাটকে পিয়ারার মুখে তার প্রশংসা করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভক্তির মাধ্যমেও দেশ মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিপনের ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মাতৃভক্তি তথা দেশমাতার প্রতি যেকোনো সুযোগে

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সে সময়ের যুগলক্ষণ রূপে এ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। জননীর সঙ্গে জন্মভূমির মেলবন্ধনের কথা সে যুগের সাহিত্যে ও জীবনে বাস্তবরূপ লাভ করেছিল; তাই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের উক্তি—‘জননী জন্মভূমি সর্গাদপি গরীয়সী’। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরার উক্তি “মা তুমিই আমার মা। ... তুমি আমার ভারতবর্ষ।”^{৪০}

চন্দ্রগুপ্তের মা মূরা শূদ্র রমণী তাই মগধরাজ বিমাতা শূদ্রানী মূরাকে অপমান করে। এ অপমান চন্দ্রগুপ্তের নিজেরও। তাই মাতৃ অপমানের শোধ নিতে তিনি গ্রীক শিবিরে অস্ত্রশিক্ষা নিতে যান। ঘটনাচক্রে নন্দশত্রু চাণক্যের সঙ্গে মিলিত হন। রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করেন। কঠোর পরিশ্রম এবং অদম্য মনোবলের গুণেই তিনি অপমানিত মাতার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

“অপমানিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা সেই যুগের বিশিষ্ট ধর্ম ছিল।... ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে শূদ্রানী মূরা এই অপমানিত মানবতার প্রতীক। নন্দ তাঁহাকে শূদ্রাণী বলিয়া অপমানিত করিয়াছিল—মুরার সমগ্র নাট্যিক আচরণের মধ্যে তাহারই প্রতিহিংসা গ্রহণের দুরন্ত প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ... মুরার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের ভিতর দিয়াই নাট্যকার নির্যাতিত মানবতার বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভাবে একটি বিশিষ্ট যুগধর্ম এখানে স্বীকৃত হওয়াতে ইহার মধ্যে জনসাধারণের হৃদয়ের যোগ অতি সহজেই স্থাপিত হইয়াছে।”^{৪১}

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই যুগলক্ষণকে কেন্দ্রকরেই নাট্যকার দেশ মাতৃকার অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিলেন দেশ বাসীর অন্তরে।

স্বদেশ ও স্বজাতিবোধ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর রচিত বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রসম্বলিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি জনচিন্তে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। একাগ্রতার সঙ্গে তিনি বাংলার মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একদিকে ইতিহাসের ঘটনা অন্যদিকে পরাধীন ভারতের ছবি এ দুইয়ে মিলে ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যুগলক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’ (১৯০৯) নাটকটি রচনা করেন। মারাঠাদের ‘শিবাজী উৎসব’-এর অনুকরণে বাংলাতেও জাতীয় উৎসব প্রবর্তন করার জন্য বঙ্গ বীরের অনুসন্ধান চলছিল। নাট্যকার এ নাটকে বাঙালীকে ক্ষত্র আদর্শে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রতাপ চরিত্রটির মধ্যে যুগলক্ষণ প্রকটিত। তিনি একজন সামন্ত বীর নন। জাতীয় বীররূপে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে গিয়েছে। নাটকটির

সূচনাতে দেখা যায় অত্যাচারী মোঘল শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত প্রজা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বিংশ শতকের দুর্বল বাঙালী জাতিকে বীরত্বের মহিমায় জাগ্রত করবার প্রয়াস দেখা যায় এ নাটকে। মোঘল শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে এবং জন্মভূমির প্রতি প্রবল স্বদেশবোধের মস্ত্রে দীক্ষিত প্রত্যাপাদিত্য চরিত্রটি সমকালের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক রূপে চিত্রিত হয়েছে।

ক্ষীরোদ প্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে যুগধর্মে ও নাট্যরসে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ‘আলমগীর’ (১৯২১) নাটকটি। কল্পিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত সশ্রুট আওরঙ্গজেবের অন্তর্মুখী জীবন কথাই এ নাটকে প্রধান্য পেয়েছে। “সাম্রাজ্যলোভ শঠতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানবতার দ্বন্দ্ব আলমগীরের চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ক্ষীরোদ প্রসাদ সমকালীন অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসঙ্গীত রচনার জন্য আলমগীরের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন।”^{৪৬} চরিত্রটি যেমন প্রচণ্ড ক্ষমতামালা আবার নিতান্তই দুর্বল। তিনি নিজেই তাঁর আপন সুকর্ম ও কুকর্মের নির্মম সমালোচক।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ চালু হবার পর যখন নাটক রচনা ও অভিনয়ের স্বাধীনতা হরণ করা হল তখন বাংলা নাটকের গতিপথ পরিবর্তিত হল, শাসকবিরোধী নাটক রচনা বন্ধ হল। শুরু হল পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে জীবনবিরোধী দেববাদ ভিত্তিক নাটকের ধারা। প্রায় দীর্ঘ তিন দশক পর বিশ শতকের গোড়ায় এসে পৌরাণিক নাট্যধারা পরিবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক নাট্যধারায় যুগের প্রয়োজনে জাতীয়তাবোধ উদ্ভূত হয়ে নাট্যকারগণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন ঐতিহাসিক নাটক। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার খসড়ার কথা ঘোষণা। ১৯০৫ সালে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করবার অপপ্রচেষ্টা। ফলে সারা দেশব্যাপী প্রতিরোধ ও গণআন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। “স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সেই নব উদ্বোধনের দিনে বাঙালি আবার স্বদেশিকতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধিতায় মত্ত হলো।”^{৪৭} এই স্বদেশী আন্দোলনে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা। জাতির এই মুক্তি-আন্দোলন সেদিন বাংলা নাটকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। জাতির এই মুক্তি-আন্দোলনে প্রবল ভাবে ছিল জাতীয় ভাবাবেগ। এসময়ে রচিত নাটকগুলিও ছিল প্রবলভাবে স্বদেশিক চেতনায় উদ্ভূত। রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ এসব নাটকে স্থান পায় নি। “কখনও ইতিহাসের অতীত মোড়কে, কখনও মুসলমান শাসকের অত্যাচারের রূপকে, কখনো জাতীয়তাবাদী হিন্দু নায়কদের উত্থানের কাহিনী বর্ণনায়—এইসব নাটক জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের চেষ্টা করেছিল।”^{৪৮} এই জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের মাধ্যমেই এপর্বের নাটকগুলিতে পরোক্ষভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ মুখরিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র পর্বঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যতম এক বড় প্রবণতা হল বন্ধন থেকে মুক্তি, মলিনতা বা কুৎসিৎ থেকে সৌন্দর্য, ক্ষুদ্র সত্ত্বা থেকে বৃহৎ সত্ত্বা, হিংসা থেকে প্রেম বা শান্তি এবং জড়তা থেকে বেড়িয়ে এসে প্রাণের জয়ধ্বনি। এভাবেই দেশ-কাল-পাত্রকে তিনি জীবনের গভীর উপলব্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর এই বিশ্লেষণী শক্তির সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন নাট্যকাব্য-কাব্যনাট্য, নিয়মানুগ নাটক, রঙ্গ নাটক এবং রূপক-সাংকেতিক নাটক।^{৪৮} আলোচ্য পর্বে নিয়মানুগ পর্যায়ের এবং রূপক সাংকেতিক পর্যায়ের নির্দিষ্ট কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা করা হল। আলোচ্য নাটকগুলি হল—‘বিসর্জন’(১৮৯০), ‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘মুক্তধারা’ (১৯২৫), ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬), ‘কালের যাত্রা’ (১৯৩২)।

নিয়মানুগ পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে একটি অন্যতম হল ‘বিসর্জন’ (১৮৯০)। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের কাহিনীকে কেন্দ্র করে এ নাটকটি লিখিত। ত্রিপুরার রাজা বলি প্রথা বন্ধ করলে পুরোহিত রঘুপতি রুষ্ট হন। এবং প্রজাদের রাজদ্রোহী করে তুলবার জন্য উত্তেজিত করেন। একদিকে প্রথা বা সংস্কারের সঙ্গে অপরদিকে প্রেমের সংঘাত প্রকটিত হয়েছে নাটকটিতে। “বিসর্জন”-এর মধ্যে শুধু বলিদানের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধেও যেন একটা প্রতিবাদ রহিয়াছে।^{৪৯}

পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে।

“আধুনিক সভ্যতার আদর্শে বৃহত্তর সমাজ ও মানবতার কল্যাণের মাপকাঠিতে ইহাদের বিচার ও বিবেচনা আরম্ভ হইল। সংস্কারের জড়ত্ব হইতে মুক্তির সর্বপ্রথম প্রয়াস তখনই এদেশের সমাজের মধ্যে দেখা দিল, গতিশক্তিহীন নির্জীব সমাজব্যবস্থার অচলায়তনকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।”^{৫০}

কেননা, ধর্মের নামে আমাদের দেশে যে সহিংস ব্যাপার দীর্ঘদিন ধরে ঘটে আসছে; রবীন্দ্রনাথ সেটাকে কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ধর্ম তাঁর গভীর মানবতা বোধ থেকে উদ্ভূত যা সর্বব্যাপী প্রেম ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। “চণ্ড ধর্মের বিরুদ্ধে প্রেমের ধর্মের, আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে হৃদয়ভক্তির ও কল্যানধর্মের জয়”^{৫১} এ নাটকের মূল বিষয়। তাই বলা যায় যে ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে ‘বিসর্জন’ নাটকের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে ‘অচলায়তন’ (১৯১২) একটি অন্যতম নাটক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি এবং সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সমকালীন সমাজব্যবস্থার বড় গলদ কোথায় তা জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। রাষ্ট্র-শাসনের যথার্থ রূপকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ধনতন্ত্রী অত্যাচারের মূল কোথায় প্রোথিত এবং তাকে কীভাবে উপড়ে ফেলা সম্ভব এসব বিষয়ে তিনি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন একান্ত হৃদয়ে। তিনি দেখেছেন আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন সব নীতি-নিয়ম প্রচলিত যাদের ফলে মানুষের জীবনের স্বাধীন বিকাশ পদে পদে খণ্ডিত হয়। এই বাঁধাপ্রাপ্ত বা দুঃখভোগী মানুষের সংগ্রামের কথাই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর এই রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে। ‘অচলায়তন’ নাটকের মধ্যেও এই সংগ্রাম নিরন্তর ভাবে চলেছে।

‘অচলায়তন’ হল একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় আচার সমূহের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের চারদিক দিয়ে উচ্চ প্রাচীর তুলে দিয়ে জগতের সঙ্গে এর বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এতে বাইরের সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। এই বদ্ধ প্রাচীরের ভিতরে আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায় সহ অনেক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছেন। আবার শিক্ষার্থী বালকেরাও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা উপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো প্রাত্যহিক বাঁধা মন্ত্রপাঠ ও নির্দিষ্ট আচার সমূহ পালন করে থাকে। পঞ্চক নামক নবাগত ছাত্রটিই একমাত্র আচার-বিদ্রোহী, সে কিছুতেই অচলায়তনের নিয়মের বশে আসে না। তাকে অন্ত্যজ শ্রেণীর পল্লীতে নির্বাসিত করা হলে, তার সহচর অন্ত্যজ শ্রেণীর বালক শোনাপাংশুদের সহযোগিতায় অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে অচলায়তনের বহুদিনের অবরুদ্ধ অন্ধকার দূর হয়ে তাতে আলো প্রবেশ করল। পঞ্চক আসলে অচলায়তনের কৃত্রিম বিদ্যার ভারকে বহন করতে পারেনি। এ বিদ্যা মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, মানুষের জীবন-বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সুযোগ পেলেই পঞ্চক অচলায়তনের বাইরে থাকা শোনাপাংশুদের সঙ্গে মেলামেশা করত। কেননা এদের মধ্যে পঞ্চক মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। পঞ্চক সে পথেরই পথিক হতে চায়। সে নিয়মবদ্ধ মানুষের মুক্তি পিপাসার প্রতীক।

এ নাটকে দাদাঠাকুর চরিত্রটি সত্যের রূপক। কিন্তু তার পরিচয় সুস্পষ্ট নয়, তিনি এখানে অন্ত্যজ মানুষদের সহচর। যেসব মানুষ সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকারী, তাঁরা তাদের সঙ্গ লাভ করতে পারে। সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবন দিয়ে তিনি কৃত্রিম সংস্কার-রুদ্ধজীবন জয় করলেন— অন্ত্যজ শোনাপাংশু, ভদ্রক এদের সহায়তায় অচলায়তনের প্রাচীর ভেদ করে প্রবেশ করবার তাৎপর্য এখানেই।

‘অচলায়তন’ নাটকে জড়শক্তি অক্ষসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির দ্বন্দ্ব দেখা যায়। প্রাণশক্তির বিকাশের অন্তরায় এই নির্মম আচারনিষ্ঠ অক্ষসংস্কারকে পরাজিত করে শেষে প্রাণশক্তির মুক্তি ঘটেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন—“এই নাটকের মধ্যে হিন্দু ধর্মের উপর যে আক্রমণমূলক মনোভাব রহিয়াছে, তাহার জন্য ইহার বিরুদ্ধে এদেশে একদা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহারই ‘অভিনয় যোগ্য সংস্করণ’ ‘গুরু’ প্রকাশিত হয়।”^{৬২} হিন্দু ধর্মের আচারসর্বস্বতা ও অক্ষসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ‘অচলায়তন’ নাটকে।

সম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার অশুভ শক্তির মিলন ঘটলে শক্তিকামী মানবসমাজের কাছে তা কতখানি ভয়ঙ্কর বিভীষিকা হতে পারে তারই চিত্র প্রতিফলিত ‘মুক্তধারা’ (১৯২৫) নাটকে। পরিণত বয়সে অর্থাৎ যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ষাট বছর, সে সময়ে তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সে সময়ে

“গভীরতর দৃষ্টির দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতার যে স্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আশা ও আশ্বাসের পরিবর্তে তাঁহার মনে গভীর নিরাশা ও আশঙ্কার সৃষ্টি করিল। তিনি এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ এর সম্মেলনের উত্তরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ‘শিক্ষার মিলন’ বিষয়ক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই সম্পর্কে পাশ্চাত্য জাতীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার প্রকৃতি উদ্ঘাটন করেন।”^{৬৩}

যন্ত্র সভ্যতা যে কী রকম ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে তা ব্যক্ত করতে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়ে রচনা করলেন ‘মুক্তধারা’ নাটকটি। উত্তরকূট পার্বত্য রাজ্যের শাসকশ্রেণী যন্ত্ররাজ বিভূতির সাহায্যে উত্তরকূটের ‘মুক্তধারা’র বার্ণার পথ বন্ধ করবার জন্য লৌহবাঁধ নির্মাণ করে। ফলে শিবতরাইয়ের অগণিত সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয়। কিন্তু রাজপুত্র অভিজিৎ রাজা রণজিতের অহঙ্কারকে চূর্ণ করে দেয়। সে জীবন দিয়েও মুক্তধারার বার্নার পথকে মুক্ত করে দেয়, লৌহবাঁধ ভেঙে মুক্তধারার জলস্রোতে নিজের জীবনকেও ভাসিয়ে দেয়। “যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়ো, সে কথা মানুষকে প্রাণ দিয়েই প্রমাণ করতে হয়, অভিজিৎ সেই শহীদ মানুষের প্রতীক।”^{৬৪}

নাটকে রাজা রণজিৎ যেন রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি, বিভূতি যেন যন্ত্র সভ্যতার প্রতীক আর অভিজিৎ যেন প্রাণশক্তির প্রতীক। বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থায় রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেন ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। তার জায়গায় জগদল পাথরের মতো আধিপত্য কায়ম করে চলেছে বিজ্ঞান সভ্যতার বাহন যন্ত্র সভ্যতা। সমাজ-রাষ্ট্র আজ যন্ত্রশক্তির দ্বারা

শাসিত। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ যন্ত্রশক্তির পদতলে চিরকাল মানব সমাজের মনুষ্যত্ব পিষ্ট হয়ে চলতে পারে না। এই প্রাণঘাতী যন্ত্রশক্তির পরাজয় একদিন হবেই। সেদিন যুগ-যুগান্তরের নিপীড়িত মানবাত্মা মুক্তির মন্ত্রে জাগরিত হয়ে উঠবে; শাস্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন পৃথিবীতে। অভিজিৎ যেন সেই অনাগত সমাজের অগ্রদূত। যন্ত্র যে মনুষ্যত্বকে কতটা পঙ্গু করে দিতে পারে তার প্রমাণ হল উত্তরকূটের শাসন কর্তারা। তারা দেবতার পরিবর্তে অপদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। অপদেবতাকেই তারা ভাগ্যবিধাতা রূপে বরণ করেছে। এ অপদেবতা তাদেরকে দিয়েছে কলুসিত সাম্রাজ্যবাদ, দিয়েছে জীবনকে বাঁধবার উপায় এবং মানুষকে মারবার অস্ত্র। সে কারণেই আজ যন্ত্রবাদী পাশ্চাত্য জাতিগুলির উগ্রজাতীয়তাবাদের আড়ালে থেকে বিশ্বের চতুর্দিকে তার অশুভ শক্তির বাহু বিস্তার করেছে এই কলুসিত সাম্রাজ্যবাদই।^{৬৬}

শিবতরাইয়ের শোষিত প্রজারা যেন পরাধীন ভারতের বাসিন্দা। “উত্তরকূটের বিরুদ্ধে শিবতরাইয়ের যে সংগ্রাম তাহার সহিতও ভারতের অহিংস সংগ্রামের সুস্পষ্ট মিল রহিয়াছে।”^{৬৭} ‘মুক্তধারা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ জড়শক্তি তথা পাশ্চাত্য যান্ত্রিকতা ও হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। উত্তরকূটের দেবতা মানুষের জন্য যে বার্না দিয়েছে, উত্তরকূটের যন্ত্ররাজ তাকে বেঁধে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। উত্তরকূটের আকাশের একদিকে যন্ত্ররাজ বিভূতির লৌহযন্ত্র অপর দিকে দেবতা ভৈরবের মন্দির চূড়া। দুই বিপরীত দিকে দুটি প্রতীককে স্থাপন করে কবি যেন উভয়ের মধ্যকার বিরোধটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন।^{৬৮}

অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিয়ে দেবতাকে দাসত্ব থেকে, অর্ঘ্যকে বৃত্তিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। মুক্তধারার পুনঃপ্রবাহমানতার মাধ্যমে দেবতা ভূত্ব থেকে এবং মানুষ দেবলঙঘী মানবত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তধারার বাঁধ ভাঙা যেন এ দুই মুক্তিরই প্রতীক। অভিজিৎ প্রাণের দ্বারা যন্ত্রকে ভেঙেছে। এতে প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত। বিভূতি-অভিজিৎ মিলে যেমন উত্তরকূটের পূর্ণ পরিচয়, তেমনি কবি মানস এবং বিদ্রোহী ব্যবহার মিলেই অভিজিৎের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। যন্ত্রদানব সৃষ্ট উত্তরকূটের লৌহবাঁধ ভেঙে ফেলা এবং আত্মবিসর্জন অভিজিৎের মহৎ অবদান। তাঁর এই আত্মদানের মাধ্যমে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে।

‘রক্তকরবী’ (১৯২৬) যন্ত্র যেমন আধুনিক জড়বাদী বিশ্বসভ্যতার একটি উপাদান ঠিক তেমনি অন্য আর একটি উপাদান হল ধনতন্ত্র। এই দুইয়ের পারস্পরিক মিলনে উদ্ভূত যান্ত্রিক ধনতন্ত্র। আর এই যান্ত্রিক ধনতন্ত্র থেকে যে সব বস্তুশক্তির উদ্ভব তাহা জড়বাদী বিশ্বের উপর সর্বগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথ জড়বাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হল ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬) নাটকে জড়বাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রবাদ।

নাটকটির প্রধান দুটি চরিত্র যক্ষপুরীর রাজা এবং নন্দিনী। একজন আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক। আরেকজন কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক। একজন জড়শক্তি ও প্রাণশক্তির সংমিশ্রণ; আর এক জনের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাস, যা প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণে পরিপূর্ণ। আকর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে কর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্বই হল রক্তকরবী নাটকের মূল কথা। “স্পষ্টত ইহা দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি কৃষিনির্ভর সভ্যতার সহিত যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার দ্বন্দ্ব।”^{৪৮}

নন্দিনী যার মানব রূপ, রক্তকরবী ফুল তারই প্রতীক রূপ, রূপে ভিন্ন কিন্তু স্বরূপে এক। নন্দিনী যেন পৃথিবীর উপরিতলের মুক্ত জীবন ও সৌন্দর্যের আধার, রক্তকরবী তার প্রিয় অলঙ্কার।

যক্ষপুরীর রাজা যক্ষরাজ। তার মধ্যে রয়েছে জড় ও জীবনের দ্বৈত লীলা। তাই যক্ষরাজের দ্বন্দ্ব নিজের সঙ্গেই। সে যে জালের আবরণের অন্তরালে অবস্থিত সেই জাল বহির্জগতের আলো থেকে তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। প্রাণের লীলা ভূমি থেকে নির্বাসিত করে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছে। এখানে সে তার মানুষী সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে এবং তার জায়গায় এক অমানুষী দৈত্য যক্ষের ধন আগলে বসে আছে। কিন্তু জালের আবরণকে ভেদ করে যথা সময়ে হাজির হয় নন্দিনী যেন এক বলক জীবনের আলোক সেই বন্দীশালায় প্রবেশ করল। সেই আলোর সঞ্জীবনী স্পর্শে মৃত মানুষটি আবার বেঁচে উঠল এবং তারপরেই শুরু হল মানুষ ও দৈত্যের এক নিদারুণ লড়াই। মানুষরূপী রাজার শেষ সংগ্রাম শুরু হল তারই শক্তির বিরুদ্ধে।

অর্থহীন সঞ্চয়ের দ্বারা ধন যেখানে বহুলত্ব লাভ করে কল্যাণের পথকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দেয় সেটাই হচ্ছে যক্ষপুরী। সেখানকার মানুষের কোন ব্যক্তিত্ব নেই; তাদের কোন পরিচিতি নেই; তাদের পরিচয় গাণিতিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। যক্ষপুরীর “সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় ৪৭ফ, ৬৯ঙ, ধনতান্ত্রিক প্রশাসনের যাঁতাকলে পড়ে মানুষের পরিচয় দাঁড়িয়েছে গাণিতিক সংখ্যায়। প্রাচ্যের অপপ্রচারিত মিস্টিক ও রোমান্টিক পুরুষ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষ ও মানুষের স্ববির পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।”^{৪৯} ‘রক্তকরবী’ নাটকে তারই প্রকাশ রয়েছে। সে কারণেই নাটকে দেখানো হয়েছে যক্ষপুরীর প্রাণহীন পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

‘কালের যাত্রা’ (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সমাজতত্ত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন রূপকের আশ্রয়ে উপস্থিত করেছেন ‘কালের যাত্রা’ নাটকে। পুরোহিত শক্তি, রাজশক্তি, বণিকশক্তির টানে রথের চাকা ঘুরল না। কিন্তু শূদ্র বা সাধারণ মানুষের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই রথ হরহর করে এগিয়ে

চলল।

নাটকটি উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাতান্ন বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ উপহার রূপে অর্পিত হয়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিকট একটি লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির বিষয় ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

“রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রস্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছেন রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদের আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবে সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।”^{৬০}

সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী তথা শূদ্র শ্রেণীর জাগরণের কথা রয়েছে নাটকে। মানুষের মানবিকতা যখন লুপ্ত হয় অপর মানুষের মনুষ্যত্বকে আঘাত করে তখন এক শ্রেণীর মানুষের এই আন্তঃসার শূন্য গরিমা তাদের অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাইতো কালের রথ সর্বহারা মানুষদের হাতের টানে নড়ে উঠেছে এবং রথ এগিয়ে চলেছে। রাজপথে নয় সাধারণের জনপথে।

ছন্দবদ্ধ মানব সমাজের মধ্যে ছন্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে কবির ডাক পড়ে। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, সমাজে সমাজে অবহেলা দেশে দেশে হিংসা, সেই তো ছন্দপতন। মানব সম্বন্ধ মানবের যদি অন্তরের বস্তু হয়ে ওঠে তবেই মানব সমাজ ছন্দ ভঙ্গতার অপরাধ হতে মুক্তি পাবে। এখানে সেই মানব সম্বন্ধেরই প্রতীক রথের রশি।^{৬১} মানব সম্বন্ধের এই অবমাননা যে অমানবিকতার পরিচয় যার মধ্যে বিরাজ করে রয়েছে জড়শক্তি। আর কবি এই মানব সম্বন্ধের অবমাননার রূপ জড়শক্তির বিরুদ্ধেই প্রতীবাদী হয়ে উঠেছেন ‘কালের যাত্রা’ নাটকে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকের তত্ত্ববস্তু এবং নাট্যসংঘাতের মূলে রয়েছে এক মৌলিক দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব প্রাণধর্মের সঙ্গে জড়ধর্মের। এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই বর্তমান। মুক্তির মধ্যেই জীবন, মুক্তির মধ্যেই আনন্দ। সেখানে কোন বাঁধা বন্ধন নেই। যখনই এই অবাধ মুক্তির প্রকাশ ঘটে তখনই মানুষের অব্যবহৃত প্রাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। মুক্ত প্রাণের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড় শক্তির একটা নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে। এই জড় শক্তি বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন আকারে প্রকারে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই জড়শক্তির উদ্দেশ্য ও ধর্ম এক সেটা হল প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠায়

বাধা প্রদান করা এবং জড়শক্তির ঔদ্ধত্যকে সর্গর্বে প্রচার করা।

অচলায়তন নাটকে এই জড়শক্তির অন্ধসংস্কার, ‘রক্তকরবী’তে আকর্ষণজীবী ধনতন্ত্র, ‘মুক্তধারা’য় সাম্রাজ্যবাদী লৌহযন্ত্র এবং ‘কালের যাত্রা’য় বর্ণপ্রথা বা অস্পৃশ্যতার রূপ ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তপ্রাণের অন্তরায় এসব বাঁধা বা জড়শক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল তাঁর সুতীর প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যা তার রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রোত্তর পর্ব : উনিশ শতকের বাংলা নাটকে যে ধর্মীয় উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। তা বিশ শতকের গোড়ার দিকে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। বিশ শতকের ভাব বিপ্লবের স্পর্শে দেশবাসী পেল সর্বশক্তিময় বিজ্ঞানের অদ্ভুত লীলার পরিচয়। ফলে দেশের মানুষের মন ধীরে ধীরে আধ্যাত্ম বিমুখ ও ইহসর্বস্ব হয়ে উঠল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে অধিকার করতে লাগল। তবু এসময়ে যে আধ্যাত্মিক বা পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটক লেখা হয়নি এমন নয়, বরং পৌরাণিক বিষয়ের আদলে সমকালের জটিলতাকে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন কোন কোন নাট্যকার।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে দু’একজন নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছেন তাদের নাটকের সঙ্গে পূর্বের পৌরাণিক নাটকগুলির কোন যোগসূত্র নেই। চিরপালিত ধর্মাধর্ম ও ভক্তিভাব আধুনিক পৌরাণিক নাটকে নেই বললেই চলে বরং গতানুগতিক পৌরাণিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে এই নাটকগুলিতে। এছাড়াও দেখা যায়

“১৯৩৯ -এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত বাংলা নাটকে আর একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। মোহন দাস গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অনেক নাট্যকারের রচনাতেই এই গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন ও গৈরিক পতাকা একাকার হয়ে গিয়েছিল।”^{৬২}

রবীন্দ্রোত্তর পর্বে যে কয়েকটি নাটকের ওপর আলোচনার মাধ্যমে বাংলা নাটকের প্রতিবাদী ধারাকে অনুসরণ করা হবে, সেগুলি হল—

মন্মথ রায়-‘কারাগার’, ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’, শচীন সেনগুপ্ত -‘গৈরিক পতাকা’।

পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ‘কারাগার’ (১৯৩০) নাটকটি লেখা হলেও নাটকটির বিষয়বস্তুর গভীরে রয়েছে অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ধিক্কার। নাটকটির রচনাকালে পরাধীন ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলে। ফলে দেশের কোটি কোটি মানুষ

কারারুদ্ধ হন। বিদেশীদের কারাগার স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠে। পরাধীন জাতির পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনায় নতুন শক্তি জন্মলাভ করল।

কংসের কারাগার যেন পরাধীন ভারত ভূমি। বসুদেব, দেবকী, কঙ্কন প্রমুখরা যেন সেই ভারত ভূমির শৃঙ্খলিত সন্তান। কংস অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক। বসুদেব সংগ্রামী জনগনের প্রতিনিধি। নাটকটিতে রয়েছে “একদিকে নৃশংস অত্যাচার, অন্যদিকে সেই অত্যাচার প্রতিরোধে দুর্জয় সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম।”^{৬০} সেই সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে শাসক ব্রিটিশ শক্তির শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কারাগার নাটকে প্রচলিতসমাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক স্থানে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকার সমসাময়িক যুগের মানবতাবাদী বিদ্রোহত্মক দৃষ্টি দ্বারা চালিত হয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় পৌরাণিক বিষয়ের আদলে তিনি পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন— “কারাগারের মধ্যে কংস, কংসের কারাগার, বসুদেব, কঙ্কন-কঙ্কার সংগ্রাম সবকিছুর মধ্যে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যঞ্জনা রয়েছে আবার... কংসের মধ্যে নাট্যকারের প্রতিরোধী ও বিদ্রোহী ভাবনার রূপায়ন হয়েছে।”^{৬৪}

শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে মন্থন রায়ের ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ (১৯৫৮) নাটকটিতেও। দিনের পর দিন হিন্দু মহাজনদের অন্যায়-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালেরা এক আশ্চর্য শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহের চেতনায় দলবদ্ধ হয়। যদিও তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষক জমিদারশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ কম গুরুত্বের বিষয় নয়। “দশ হাজার সাঁওতাল যখন এক সঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, বণিক ও শাসকের অচলায়তনের ভিত সেদিন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।”^{৬৫}

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অতি আধুনিক মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন ‘গৈরিক পতাকা’ (১৯৩০) নাটকটিতে। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাস নিয়ে রচিত এই নাটকটি। এতে নাট্যকার আধুনিক দেশাত্মবোধের আদর্শকে অবলম্বন করেছেন। শিবাজী চরিত্রের দৃঢ়তা, কোমলতা, তার নিষ্ঠা ও ভক্তি নাটকটিতে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। শিবাজী চরিত্রটি জাতীয়তার ভাব উদ্দীপনে আদর্শ চরিত্র। আর এই জাতীয়তা বোধের সঞ্চারণের মাধ্যমেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য শিবাজীর যে মৃত্যুপণ সংগ্রাম এবং তার গৌরবময় জয় নাটকটিতে দেখানো হয়েছে, তা যেন মুক্তি সংগ্রামীদের কাছে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় শক্তির জয়।

মুক্তি সংগ্রামীদের বিদ্রোহের প্রতিনিধি বিদ্রোহী হিসেবে শিবাজী চরিত্রের আত্মপ্রকাশ।

বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পর্ব : এ পর্বে দেখা যায় যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ প্রভৃতির ফলে বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নেমে আসে আকস্মিক বিপর্যয়। শান্তির জীবন, শান্তির নীড় সব কিছুই যেন আচমকা আঘাতে অবলম্বনহীন শূন্যতার মাঝে হাহাকার করতে লাগল। চারিদিকে মৃত্যুর হুঙ্কার, বিদেশী সৈনিকের আত্মফালন, বিভীষিকাময় ঘন অন্ধকার যে সব সময় তাড়া করে বেড়ায়। তার পাশাপাশি অন্ধকার জগতের কালোবাজারি মুনাফাবাজ, মজুতদারদের কালোবাজারি দ্রব্যের আদান প্রদান চলতে থাকে। দেশের সমস্ত নীতি-সংস্কার-ধর্ম যেন কালো অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

সাধারণ মানুষের দুঃখের আর সীমা নেই, দুর্দশার আর অন্ত নেই। সাধারণ মানুষের এই দুঃখের দিনে সুযোগ বুঝে দালাল, ঠিকাদার ও অসাধু ব্যবসায়ীরা পরম আনন্দে সমাজের অবশিষ্ট রক্তটুকুকে পিশাচের মতো শুষে নিতে থাকে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ব্যথা না সাড়তেই দেশের বৃকে আরেক আঘাত এসে হাজির হল। অনেকটা গোদের উপর বিষফোঁসার মতোই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের ক্ষত চিহ্নকে সঙ্গে করেই দেশ একদিন স্বাধীনতা অর্জন করল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবনে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও পরিবর্তনের ঝড় ওঠে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, বাস্তব ত্যাগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। জমিদারী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। পাশাপাশি মধ্যস্থত্ব ভোগী বহু লোক গ্রামের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করে নানা নতুন বৃত্তি অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে যখন দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ ঘটল। তখন শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং সাম্যবাদী নীতি সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটতে থাকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এবং উত্থান হতে থাকে পূঁজিবাদী সমাজের। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও দেখা যায় সমষ্টিগত বা একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যেতে থাকে। গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে যায়। এবং সেখানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়। ফলে তাদের বংশমর্যাদা, বর্ণমর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়।

পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও স্বাধীন বৃত্তি ধারণ করতে হল। বিবাহ বিচ্ছেদের মতো বিভিন্ন বৈপ্লবিক আইন প্রবর্তনের ফলে সতীত্ব ও পাতিব্রতের প্রতি নারীদের আর শ্রদ্ধা রইল না। “সামাজিক নীতি সম্বন্ধে একটা ভূক্ষেপহীন, বেপরোওয়া ভাব সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যাইতে লাগিল।”^{৬৬} এই বেপরোওয়া ভাবের মধ্যেই ধ্বনিত হয় এক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদের সুর। দেশ

ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষেরা তাদের বংশগত মান মর্যাদাকে গুরুত্ব না দিয়ে নানা শ্রমকঠিন বৃত্তিতে যোগ দিতে বাধ্য হল। কঠোর শ্রম দানের দ্বারা এসব মানুষেরা সমাজের অগ্রগতির চাকা দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু বেদনা ও বঞ্চনার স্মৃতিকে তারা একেবারে ভুলে যেতে পারেনি। তাই “সংঘবদ্ধ শক্তির মহিমা তাহারা বুঝিল, নিজেদের অধিকার আদায় করিবার জন্য তাহারা সংগ্রামের পথটি খুঁজিয়া পাইল। সমাজের মধ্যে শাস্ত নিরুদ্ভিগ্ন জীবন প্রবাহ অবসিত হইয়া আসিল, শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিক্ষোভ ও অধিকার লাভের প্রচেষ্টায় জীবন অতিমাত্রায় জর্জরিত হইয়া উঠিল।”^{৬৭}

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের এই ভয়ানক বাস্তবতার একটা রূঢ় প্রভাব তীব্রভাবে আঘাত হেনেছিল, সে সময়ের শিল্পী নাট্যকারদের মনে। এ আঘাত তাঁদের হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারই ফসল হিসেবে বাস্তবের এই ভয়ঙ্করতা প্রকাশ পেল তাঁদের বিভিন্ন শিল্প কলায়। নাটক তার মধ্যে অন্যতম।

বাংলা প্রতিবাদী নাটকের ধারাকে বিশ্লেষণ করতে এ পর্বে যে কয়েকটি নাটকের ওপর আলোচনা করা হবে সেগুলি হল—

বিজন ভট্টাচার্যের—‘নবান্ন’, তুলসী লাহিড়ির—‘ছেঁড়া তার’, সলিল সেনের—‘নতুন ইহুদী’।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাঙ্গিক বিপর্যয় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কুশীলবদের উপর প্রভাব ফেলে এবং তাঁরা পূর্ব সংস্কারকে পরিহার করে জীবনকে নগ্ন নিরাবরণ রূপে উপস্থাপন করবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল রাজনৈতিক চেতনা ও গণ আন্দোলনের ঐতিহাসিক উপলব্ধি। শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিবৃত্ত রচিত হবে, পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী এক স্বাধীন সর্বশৃঙ্খল মুক্ত মানবতার প্রতিষ্ঠা হবে এ উপলব্ধিকে অনুসরণ করেই অভিনেতা ও নাট্যকার উৎপল দত্ত একসময় গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে একটু আশার আলো তরুণ নাট্যমোদীদের চোখে উদ্ভাসিত হল। কিন্তু তাঁদের এ আশা অপূর্ণই থাকল। অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং রাজরোষের ভয়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ পিছিয়ে গেল। কিন্তু তা সত্যেও

“ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে নবনাট্য আন্দোলন তাহার যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিল। পথ নির্দেশরূপে উপস্থিত হইল ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’, ১৯৪৪ সালে তাহাদের ‘নবান্ন’ লইয়া। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য মঞ্চস্তরের পটভূমিকায় গ্রাম্য কৃষক

প্রধান সমাদ্দারের দুঃখ-বেদনা সংগ্রাম-স্বপ্নের যে চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিলেন—এক কথায় তাহাকে বৈপ্লবিক বলা যাইতে পারে।”^{৬৭}

‘নবান্ন’ (১৯৪৪) নাটক শুরুই হয়েছে পুলিশ মিলিটারি আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের দৃশ্য দিয়ে। নাটকের নায়ক প্রধান সমাদ্দার। তার দুই পুত্র ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে পুলিশের হাতে প্রাণ দিয়েছে। আর তার তিন মরাই ধান পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। নানা প্রকার দুর্যোগ, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধান তীব্র কণ্ঠে বলে—“আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব।”^{৬৮}

শত্রুর বিরুদ্ধে একা একা লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়। তাই প্রধান সমাদ্দার গ্রামের সবাইকে এগিয়ে যাবার ডাক দিয়েছে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছে। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী ‘এটা বিহিত’ করবার আশায় গ্রামবাসীদের সকলকেই প্রতিরোধে সামিল করবার জন্য চেষ্টা করে। “এই ভাবে নাটকের শুরুতেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একটা ইতিহাস সম্মত পটভূমিকা তৈরী করে নাট্যকার দেখিয়ে দিয়েছেন- এই নাটক শুধু মানুষের পড়ে পড়ে মার খাওয়ার নাটক নয়- এই নাটক প্রতিরোধের সম্ভবনায় পূর্ণ নাটক।”^{৬৯} শাসক শক্তির বিরুদ্ধে হয়তো সম্মুখ সমর নেই, কিন্তু প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের চিত্র রয়েছে সমস্ত নাটক জুড়ে।

শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি মহাজন-জোতদার হারু দত্ত। কৃষকদের জমি ভিটে মাটি জোর করে অন্যায় ভাবে দখল করতে চাইলে কুঞ্জ বাধা দেয়, প্রতিবাদ করে। জোতদারদের লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে লাঠি ধরে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলে প্রধান কুঞ্জকে চুপ করতে বলে। এর উত্তরে কুঞ্জ চিৎকার করে জানায় “কেন চুপ করার কী হয়েছে? চুপ করবে! এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে, এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।”^{৭০}

মজুতদারি ও কালোবাজারির প্রতিনিধি কালীধন খাড়ার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেচ্চার হয় নিরঞ্জন চরিত্রটি। কালীধন খাড়ার মেয়ে পাচার কারবারের শিকার হয় নিরঞ্জনের স্ত্রী। নিরঞ্জন কালীধনের এ অন্যায় সহ্য করতে পারেনি। সে ক্ষোভে প্রতিরোধে ফেটে পড়ে। হারু দত্ত ও কালীধন খাড়াকে সে পুলিশে ধরিয়ে দিতে সহযোগিতা করে।

শহরে সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা ফটো তুলতে চাইলে প্রধান তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ধনী বাড়ির উৎসবে উচ্ছিষ্টকে কেন্দ্র করে কুঞ্জ ও কুকুরের মধ্যে লড়াই এবং শেষে কুঞ্জ কুকুর দ্বারা দংশিত হলে কুঞ্জের স্ত্রী রাধিকার মুখ দিয়ে যে তিরস্কার বাণী বর্ষিত হয়েছে তা যেন শোষক শ্রেণীর প্রতিই ইঙ্গিত করে। প্রধানের এতদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবার চিৎকারে ফেটে পড়ে— “তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু- কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষণ

হয়ে গেছে বাবু তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু!”^{১১} এসকল কথা শুধু আতের নিস্ফল চিৎকার নয় একটা চাপা প্রতিবাদের আতনাদ এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।

অবশেষে সমবেত প্রতিরোধের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে ‘নবান্ন’ নাটকে। নাটকটির সমাপ্তিও হয়েছে প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই। তাই একটা ব্যবস্থার ওলট পালট করে দেওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে দয়াল চরিত্রটি প্রধানকে জানায়—“এটা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি হতে পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!”^{১২}

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ (১৯৫৩) নাটকটি রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ মন্বন্তর সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটিতে তারই এক মর্মস্পন্দ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকটিতে কৃষি জীবন ভিত্তিক দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে একটি সুখী পরিবার বিদ্ধস্ত হয়ে যায়।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম তথাকথিত বিন্শালী শোষক হাকিমুদ্দী দ্বারা বারবার অপমানিত, লাঞ্চিত হয়েছে। বন্ধু মহিমের দেওয়া দিলরুবা, জামাকাপড় এসবকে কেন্দ্র করে হাকিমুদ্দী রহিমকে চোর সাব্যস্ত করতে চায়। কৌশলে রহিমের বাবার কাছ কাছ থেকে জমি ডিক্রি করে নেয়। অভাবের তাড়নায় মানসন্মান জলাঞ্জলি দিয়ে রহিম তার স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বছিরকে যখন লঙ্গর খানায় খাবার জন্য পাঠায় তখন হাকিমুদ্দী চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়ার অজুহাতে রহিমের স্ত্রী-পুত্রকে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি ফুলজানকে পরোক্ষে কুপ্রস্তাব দেয়। হাকিমুদ্দী ধর্মের ভান করে কিন্তু তার অন্তরে ধর্মের নামে বিচরণ করছে অন্যায়-অধর্মের বিষ। কেবল ধর্মকে সে স্বার্থ হাসিলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। সে সুদখোর, পরস্বাপহারক ও প্রতারক, অন্যের জমি আত্মসাৎ করতে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের মুখের ভাত চুরি করতে, সৎমানুষকে মিথ্যা অপবাদে জেল হাজত খাটাতে, মিথ্যা কথা বলতে তার বিন্দুমাত্র বিবেক দংশিত হয় না। কিন্তু সামাজিক পরিচয়ে সে গ্রামের মাতব্বর জোতদার।

শোষক শ্রেণীর এই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে এ নাটকে। তাই রহিম প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেছে—“অঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো।”^{১৩} রহিমের সঙ্গে হাকিমুদ্দীর সংঘাত যেন গ্রামবাংলার অগণিত শোষিত লাঞ্চিত রহিমদের সঙ্গে শোষক জোতদার শ্রেণীর সংঘাত। আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে রহিম হয়তো আত্মহত্যা করেছে কিন্তু অগণিত রহিমদের কাছে শয়তান হাকিমুদ্দী নিস্তার পায়নি।

ফুলজানকে ছেড়ে দেবার জন্য প্রতিবেশীরা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এসে হাকিমুদ্দীকে যখন আক্রমণ করল, তখন তাকে জনরোষের মুখে পড়তে হল। গ্রামের মানুষের হাতে তাকে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অত্যাচারীর যথার্থ শাস্তি পেতে হয়। সব শেষে বলা যায় যে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনতার সমবেত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটিতে।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে সলিল সেন ‘নতুন ইহুদী’ (১৯৫৩) নাটকটি লেখেন। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মানি থেকে ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। ঠিক তেমনি ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় দেশভাগের অসহ্য যন্ত্রণাকে চেপে রেখে উদ্বাস্তু হতে হয় পূর্বপাকিস্থানের অত্যাচারিত মানুষদের। পরিবার ভেঙে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা পরিবারগুলো কোলকাতায় পালিয়ে এসেও ছিন্নমূল ধ্বংসের পথে পুরো পরিবারটাই কেন্দ্রচ্যুত। বংশগত মান মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তারা শুধু বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম করেছে।

বাস্তুহারা পণ্ডিত মনমোহনের ছোট ছেলে মোহন শেষ পর্যন্ত কুলির কাজ করে। মেজো ছেলে দুইখ্যা বাধ্য হয়ে চুরি কর্ম পর্যন্ত করে। কিন্তু তাকে কেউ বুঝতে চায় না। সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি তার তীব্রক্ষোভ বর্ষিত হয়েছে— “দুনিয়াটার রাজা আইজ চোর, মাতাল আর বদমাইস,”^{৭৪} বলেই তার ধারণা। সমাজের অবক্ষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষ তাদের মানবত্বকে হারায়নি; মূল্যবোধকে ভুলে যায়নি। তাই মোহন যখন কারখানায় চাকরী নেয় তখন সেখানে ধর্মঘট চলছিল। মালিক পক্ষ অনৈতিক ভাবে চাকরী দেয় কিছু শ্রমিককে। কিন্তু মহেন্দ্রর কথায় মোহনের ভুল ভাঙে। সে বুঝতে পারে এরকম অবৈধ ভাবে চাকরী নিলে তারই মতো অগনিত শ্রমিকের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা হবে।

মোহনের বড় ভাই দেশের জন্যই কারারুদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু এদেশ তাদের পরিবারকে দুঃখ-হতাশা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। তাই মোহন পচন ধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্রের প্রভাবে সে উজ্জীবিত হয়েছে। মহেন্দ্রের প্রভাবে সে উজ্জীবিত হয়েছে। মহেন্দ্র শোষিত বঞ্চিতদের চেতন্যের জাগরণে সদাব্রতী। তাই সে মোহনের উদ্দেশ্যে বলে— “মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বর্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনি মিনি খেলছে তাদের শাস্তি দেবে। হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি খতম করবেই, ভাগ্যের গোলামী তুমি আর বরদাস্ত করবেনা কিছুতেই।”^{৭৫}

আগামী দিনের এই প্রতিরোধ, সংগঠিত ক্ষমতার দ্বারা ভাগ্যের গোলামীকে অস্বীকার করাই হল ‘নতুন ইহুদী’ নাটকের শক্তি ভূমি। নতুন প্রজন্মের কাছে সন্মিলিত প্রতিরোধ এবং এই

গৌরবময় অস্তিত্বের লড়াইয়ের কথাই ব্যক্ত হয়েছে নাটকটিতে।

নবনাট্য আন্দোলনের সময় সমাজের অবক্ষয়, হতাশা সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রতিরোধের কথা প্রতিফলিত হয়েছে এ নাটকে। সৎ মানুষের বলিষ্ঠ জীবন, সমাজ গঠনের নতুন চেতনা শিল্প সম্মত ভাবে প্রকটিত হয়েছে নবনাট্য আন্দোলনের এই নাটকটিতে। তাই বলা যায় যে ‘নতুন ইহুদী’ নাটকটির মাধ্যমে “সংগ্রামী গণচেতনার উজ্জীবন নাট্যকার দেখাতে চাইছেন।”^{৭৬} নাটকের নবম দৃশ্যে মহেন্দ্র চরিত্রের মাধ্যমে সে কথা পরিস্ফুট হয়েছে—“সংঘবদ্ধ হোন, নিজেদের দাবি সম্বন্ধে সচেতন হোন।”^{৭৭} দুর্দশা গ্রন্থ উদ্বাস্ত বঞ্চিত মানুষের প্রতি মহেন্দ্রের এ আবেদন নিঃসন্দেহে চেতন্যের জাগরণ ও সমবেত প্রতিরোধ প্রতিবাদের বাতাবরণ তৈরী করে।

সুখে শান্তিতে বসবাসরত একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার এবং তার সম্পর্কিত একটি কৃষক পরিবার দেশ ভাগের মতো একটি হিংস্র কুটিল ঝটিকার মুখে পড়ে কীভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারই মর্মান্তিক কাহিনী দ্বারা সৃষ্ট ‘নতুন ইহুদী’ নাটক।

“ইহাতে একদিকে শানিত ও মার্জিত নাগরিক সমাজের কুশ্রী ও কদর্য রূপ যেমন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অন্যদিকে তেমনি দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে কীভাবে মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয় ঘটিতে পারে তাহার অতি ক্লেশকর পরিচয় দেখানো হইয়াছে। পণ্ডিতের পরিবার ধ্বংস হইল—দুইখ্যা মরিল, পরী গৃহত্যাগিনী হইল, স্বয়ং পণ্ডিত মরিল, পণ্ডিতের স্ত্রী বাঁচিয়াও মরিয়া রহিল। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যদিয়া একটি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ হাহাকার করিয়া উঠে—এই প্রতিবাদ নবলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, এই প্রতিবাদ হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।”^{৭৮}

একথা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই।

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে বাংলা নাটকের ঐতিহ্য বাস্তবের মাটি থেকে প্রাণের রস সংগ্রহ করে যুগচেতনার আলোকে তা বারে বারে সূর্যমুখীর মতো দল বিকীর্ণ করেছে। নাটকের এই বিবর্তনের সূচনা নাট্যধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে, অর্থাৎ প্রাচ্য নাট্যধারার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য নাট্যধারার সংঘাতে। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস’ তার পথ প্রদর্শক।

এরপর বস্তুতান্ত্রিক বাংলা নাটকের উদ্ভব। উমেশ চন্দ্রের ‘বিধবাবিবাহ’ থেকে ক্রমশ তার বিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। রামনারায়ণের ‘কুলীন কুল-সর্বস্ব’ তৎকালীন কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছে, মাইকেলের দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন সমাজের কদর্যতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে। দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ শোষিত নিপীড়িত জনগণের রুদ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে জাতীয়তা, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতার

তীব্র অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র নাট্যভাষায় শিল্পবোধ সম্পন্ন সাংকেতিক প্রতিকী রাজনৈতিক নাটকগুলো বাঙালির হৃদয়ে নতুন চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করল।

কিন্তু পরবর্তীকালে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার সর্বাঙ্গিক বিপর্যয় পূর্ণতর বাস্তবতা ও সমকালীন সমস্যা-সংঘাতের প্রত্যক্ষতর অভিব্যক্তির দাবি করল। বিশ্বযুদ্ধের পাশাপাশি বাংলার বুকো পঞ্চাশের মন্বন্তর নেমে এল আর এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ রূপে।

“১৯৪৩ সালে বাংলার বুকো নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। এই দুর্ভিক্ষ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিলনা, শোষণ শ্রেণীর মানুষের হাতে গড়া ছিল এই মন্বন্তর। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা সেই দুর্দিনে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আন্দোলন গড়ে তোলেন।”^{৭৯}

স্বাধীন ভারতের সর্বভারতীয় স্তরে যে সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় তার সূতিকাগার ছিল এই গণনাট্য সংঘ। এই সময়ে যে সকল প্রতিভাধর বা প্রতিবাদী শিল্পী শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের গভীর বাস্তব রূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সবাই হয় প্রত্যক্ষ, না হয় পরোক্ষ এই সংঘ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

পুরোনোকে অনুসরণ করে নয়, নতুন নাট্যবুদ্ধি, নতুন অভিনয় ধারা, প্রতিবাদী চেতনা ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয় ‘গণনাট্য সংঘ’। “ ‘নবান্ন’ প্রযোজনা দিয়ে যাত্রা শুরু ঐ যে যুগ, তাকে বলি, একদিক থেকে গণনাট্য আন্দোলনের উদ্বোধনের যুগ, আবার চেতনার দিক থেকে যুগপৎ তা ছিল অবশ্যই প্রতিবাদী।”^{৮০} প্রতিবাদের এই ধারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরবর্তী নাট্যকারদের নাটকেও বিভিন্ন ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নাট্যকার উৎপল দত্তের নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশকালের চলমানতার মাঝে যখনই কোন অন্যায় বা অপশক্তি প্রকট হয়ে উঠেছে তখনই কালের অমোঘ নিয়মে কোন এক শুভ শক্তি এসে তাকে পরাস্ত করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অপশক্তিকে পরাস্ত করতে শুভ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের চৈতন্য শক্তি। সমাজ ব্যবস্থার একটা বিশেষ জাতাকলে পিষ্ট হতে হতে সাধারণ মানুষ যখন সব কিছু হারিয়ে শূন্য হয়ে যায় তখন তারা বাধ্য হয় সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। আর দেশ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলে নাটকের প্রতিবাদের ধারা।

উল্লেখপঞ্জি :

১. T.K. Oommen, Protest and change, Studies in Social Movements, Sage publication, New Delhi, p. 30.
২. Ibid, p. 31.
৩. Narendra Mohan, Protest and Literature, Indian Literature, Sahitya Academi, Vol. 18, No. 1, p. 94.
৪. T.K. Oommen, Protest and change, Studies in Social Movements, Sage publication, New Delhi, p. 54.
৫. Narendra Mohan, Protest and Literature, Indian Literature, Sahitya Academy, Vol. 18, No. 1, p. 94.
৬. জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাট্য সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪২।
৭. তদেব, পৃ. ২৪২।
৮. তদেব, পৃ. ২৪২।
৯. ড. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পাদটীকা, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৪৫।
১০. তদেব, পৃ. ১৩৪।
১১. ড. পুলিন দাস, বঙ্গরঙ্গ মঞ্চ ও বাংলা নাটক, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কোল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৩, পৃ. ১৪৪।
১২. তদেব, পৃ. ১১৯।
১৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, ফেব্রুয়ারি, পৃ. ২৭৫।
১৪. ড. সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত), রাম নারায়ণ তর্করত্ন, কুলীন কুল সর্বস্ব, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম সংস্করণ, নববর্ষ, ১৪১৩, পৃ.৩০।
১৫. সন্ধ্যা বক্সী (সম্পাদনা), রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্য লোক, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ১৬।
১৬. তদেব, পৃ. ৭৫।
১৭. ড. শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, প্রথম পর্ব ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃলিঃ, কোলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৬০৫।

১৮. শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল (সম্পাদিত), 'দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন' মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কোল-
৭৩, পৃ. ৫৬।
১৯. তদেব, পৃ. ৫৭।
২০. তদেব, পৃ. ৩৯।
২১. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), মডার্ন
বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কোলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৩৪৩।
২২. ড. শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, প্রথম পর্ব ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী
প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৫৯৫।
২৩. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), মডার্ন
বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কোলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৩৪৩।
২৪. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম দে'জ
সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ১১৭।
২৫. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর,
২০০৭, পৃ. ৩২১।
২৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), মডার্ন
বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কোলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৩৫৪।
২৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সপ্তম সংস্করণ,
১৩৮৬, কোলকাতা-০৯, পৃ. ৩৩১।
২৮. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), মডার্ন
বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কোলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৩৫৪।
২৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সপ্তম সংস্করণ,
১৩৮৬, কোলকাতা-০৯, পৃ. ৩২৯।
৩০. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ,
জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ১৮৫।
৩১. ড. দেবেশকুমার আচার্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ৩১৭।
৩২. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম দে'জ
সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ১৮৩।

৩৩. তদেব, পৃ. ৩১৯।
৩৪. তদেব, পৃ. ৩২০।
৩৫. তদেব, পৃ. ৩২০।
৩৬. ড. দেবেশকুমার আচার্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ৩২০।
৩৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩, পৃ. ২৮৩।
৩৮. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ২২৪।
৩৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাজাহান, দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), স্বাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৫, কোলকাতা, পৃ. ৩৩৬।
৪০. তদেব, পৃ. ৩৩৭।
৪১. তদেব, পৃ. ৩৩৭।
৪২. তদেব, পৃ. ৩৩৪।
৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোরা, উপন্যাস সমগ্র, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২, কোলকাতা-৯, পৃ. ৩০৪।
৪৪. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৩০২।
৪৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কোলকাতা- ০৯, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬, পৃ. ৩০২-৩০৩।
৪৬. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ৩২২।
৪৭. তদেব, পৃ. ৩২২।
৪৮. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ কঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৪৮৮।
৪৯. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ২৬২।
৫০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩, এ মুখার্জী

- অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ১৩১।
৫১. ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, তুলসী প্রকাশনী, কোলকাতা-০৯, তৃতীয় খণ্ড, পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই, ২০০২, পৃ. ৩৭২।
৫২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ২১১।
৫৩. তদেব, পৃ. ২১১।
৫৪. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ কঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৪৯৩।
৫৫. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ৩০৭।
৫৬. তদেব, পৃ. ৩০৮।
৫৭. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কোলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৪, পৃ. ২৪১।
৫৮. তদেব, পৃ. ২৫২।
৫৯. বাঙলা থিয়েটারের দু'শো বছর, লৌকিক উদ্যান সংকলন, প্রসঙ্গ সংস্কৃতি প্রকাশন, সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মজুমদার, কোলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ১৬৩-১৬৪।
৬০. 'বিচিত্রা', ১৩৩৯, কার্তিক সংখ্যা, পৃ. ৪৯২।
৬১. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কোলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৪, পৃ. ২৭৭।
৬২. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ৩২২-৩২৩।
৬৩. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ৩৩১।
৬৪. ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাটক ও নাট্যকার, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কোল-৭৩, পৃ. ২০৮।
৬৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২৭।
৬৬. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-

৭৩. জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ৩৬৯।
৬৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।
৬৮. বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, প্রমা প্রকাশনী, কোলকাতা-১৭, ষষ্ঠ প্রমা সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৩৩।
৬৯. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্যের নবান্ন : পুনর্মূল্যায়ন, বামাপুস্তকালয়, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ১০৪।
৭০. বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, ষষ্ঠ প্রমা সংস্করণ, প্রমা প্রকাশনী, কোলকাতা -১৭, ১৯৯৮, জানুয়ারি, পৃ. ৬২।
৭১. তদেব, পৃ. ৮৪।
৭২. তদেব, পৃ. ১৩১।
৭৩. ড. সনাতন গোস্বামী (সম্পাঃ), 'তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়া তার', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ, কোলকাতা- ০৯, অক্টোবর, ২০০৬, পৃ. ৯৪।
৭৪. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), 'সলিল সেন নতুন ইহুদী', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, পৃ. ৭২।
৭৫. তদেব, পৃ. ৯৬।
৭৬. তদেব, পৃ. ১৭।
৭৭. তদেব, পৃ. ৬৬।
৭৮. ড. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ৩৯৫।
৭৯. আতাউর রহমান, 'বাংলাদেশের নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', বাংলা থিয়েটারের দু'শো বছর, লৌকিক উদ্যান সংকলন, প্রসঙ্গ সংস্কৃতি, কোলকাতা-৬, সম্পাদক- প্রেমেন্দ্র মজুমদার, কোলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ১৬৪-১৬৫।
৮০. তদেব, পৃ. ১৬৫।